Vol. 52 | No. 1 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাখতিনের আখ্যানতত্ত্ব ও ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা'

Volume	52
Issue	1
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হামীম কামরুল হক
Published online	October 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v52i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i1.6
Pages	১৫৭-১৭৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাখতিনের আখ্যানতত্ত্ব ও ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*

Check for updates

হামীম কামরুল হক*

১. বাখতিনের আখ্যানতত্ত্বের ভূমিকা ও *খোয়াবনামা* উপন্যাসের কয়েকটি সংযোগবিন্দু

মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫)-এর প্রধান পরিচয় তিনি একজন রুশ সাহিত্যতাত্ত্বিক। সাহিত্যের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসম্পন্ন বেশ কয়েকটি গ্রন্থ তিনি লিখেছেন, এর ভেতরে দুটি গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তিনি বিশেষভাবে খ্যাতিমান। গ্রন্থ দুটো হলো, *Problems of Dostoevsky's Poetics* এবং *The Dialogic Imagination : Four Essays*। এ দুটি গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি মূলত রুশ ঔপন্যাসিক ফিওদর দস্তয়েভস্কির নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান নির্ণয় করেছিলেন। তিনি এ কাজটি করতে গিয়ে আরেকটি কাজ করেন, তা হলো আর্বিভাব এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে উপন্যাসের 'উপন্যাসত্ব' কোথায় নিহিত থাকে তার শনাক্তকরণ।

> ভুললে চলে না যে, উপন্যাসের বিষয় কী, নাটকে, কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা শিল্পের উপকরণ মাত্র। প্রকরণই শিল্প, শিল্পের বহিরঙ্গ আয়োজনকে যা অনিবার্য করে তোলে। কোনো উপন্যাস কেন উপন্যাস, একটি নাটকের নাটকত্ব কোথায়, কথাগুলি কেন কবিতা হয়ে উঠল — এমন বিবেচনাই দীক্ষিত পাঠকের মনোযোগের যোগ্য হতে পারে। (অমিতাভ, ২০১০ : ৩)

বাখতিনের আগে উপন্যাস নিয়ে এই চিন্তায়নে এর উপকরণগত দিকগুলিই প্রাধ্যান্য পেয়ে আসছিল। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৪৮) অঙ্গসংস্থান বা অ্যানাটমি দিয়ে যেমন মানুষের স্বরূপ ধরা যায় না — এর জন্য চাই, তার চিন্তা ও মনের পরিচয়, উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাখতিন সেই কাজটি করলেন। বাখতিন দেখিয়ে দিলেন 'উপন্যাসের মন'টা কোথায় থাকে এবং উপন্যাসের সত্তাটাকে বুঝতে হলে এর কোন বৈশিষ্ট্যটাকে বুঝে নিতে হবে। তাঁর তত্ত্ব থেকেই প্রথম স্পষ্ট হয় — কোনো একটি আখ্যানের উপন্যাস হয়ে ওঠার নান্দনিক এককটি (ইউনিট) কী? (দেবেশ, ১৯৯১ : ৪৮) কিন্তু সমস্যা হলো, উপন্যাস এমন এক শিল্পমাধ্যম যেটি এখনো সজীব। মহাকাব্যের মতো এর মৃত্যু হয়নি। ফলে,

> উপন্যাস কী — এই প্রশ্ন করা চলে তখনই উপন্যাসের চরম অভিব্যক্তি যখন স্থির হয়ে গেছে, এই স্থিরতায় উপন্যাস এমন একটি বস্তুতে পরিণত যার সব রহস্যই আমাদের করতলগত। এটা সম্ভব তখন উপন্যাস তার বিষয়কে যখন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছে, কিন্তু তা অসম্ভব, কারণ উপন্যাসের বিষয় জীবন, এবং জীবনের সমূহ জটিলতা, বহুমুখীন সম্ভাবনা ও তার বিকাশ অনিঃশেষ। (বীরেন্দ্র, ১৩৯ : ২১)

উপন্যাস কী — বাখতিন এই প্রশ্নটি করেন না, কিন্তু উপন্যাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলি তিনি মেনেও নেন না। তিনি উপন্যাসের প্রথাগত সংজ্ঞার বদলে এর সত্তার সন্ধান করেছেন — এই সন্ধানই বাখতিনের চিন্তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

---

* সহকারী সম্পাদক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য বাখতিনের উপন্যাস বিষয়ক ধারণা বিশেষভাবে সাহায্য করে, কারণ তিনি উপন্যাসের যে-নান্দনিক এককটি দেখিয়ে দিয়েছেন, সেটি হলো দ্বিবাচনিতা (dialogism)। তিনি হচ্ছেন এই দ্বিবাচনিকতার জনক। (রণবীর, ২০১১ : ৫২) এই দ্বিবাচনিকতার মাধ্যমেই তৈরি হয় বহুস্বর সঙ্গতি বা পলিফনি। একটি আখ্যান হয়ে ওঠে অনেকান্ত স্বরের সন্নিবেশ। বাখতিনের তত্ত্ব ধরেই বলা চলে, ভাষা প্রয়োগমাত্র দ্বিবাচনিকতার সূত্রপাত ঘটে। এই দ্বিবাচনিকতা যোগাযোগেরই অন্য নাম হয়ে চিহ্নিত হয়। সাহিত্যে সেই যোগাযোগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত উপন্যাস।

অন্যদিকে উপন্যাসের মূল বিবেচনার বিষয় ব্যক্তি।

> উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। এই সমাজ, সময় ও ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়। ফলে মানুষের সংজ্ঞা বারবারই নতুন করে খুঁজতে হয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট। (দেবেশ, ১৯৯৪ : ৪৯)

বাখতিনও উপন্যাসের সত্তা-সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর দ্বিবাচনিকতার পটভূমিতে রাখেন ইতিহাস ও সমাজ। কারণ তাঁর কাছে উপন্যাস হলো, "বিবিধ সামাজিক বাক্‌রীতি ও ব্যক্তিস্বরের শিল্পসম্মত বিন্যাস।" (রণবীর, ২০১১ : ৬০)

ব্যক্তি মাত্রই স্বতন্ত্র, কিন্তু একান্ত নয়। ব্যক্তি সম্পর্কে এটাই বাখতিনের মূল প্রত্যয়। (বীরেন্দ্র, ১৩৯৭ : ১৯) এভাবেই উপন্যাসে তৈরি হয় এক অনিবার্য স্ববিরোধ। এই প্রক্রিয়াটি উপন্যাসকে উপন্যাস করে তোলে। একদিকে ব্যক্তি মানুষ, অন্যদিকে সমাজ-সভ্যতার যাবতীয় উত্তরাধিকার। ফলে সমকালই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সময় হয়ে ওঠে। "সমকালকে ধরতে না পারলে উপন্যাস বাঁচে না। আবার সমকালকে ধরেও উপন্যাস বাঁচে না। সময়ের কাছে দায়বদ্ধ বলেই ঔপন্যাসিক লেখেন, কবি হয়তো অনন্তের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" (দেবেশ, ১৯৯৪ : ৪৮) আবার এর পাল্টা প্রশ্নও করা যায়, উপন্যাসের দায় তাহলে সময়হীনতারও দায়? শিল্পের কলাকৈবল্য ও সামাজিক দায়ে এতে কোন সংর্ঘষ তৈরি হয়? বাখতিনের তত্ত্ব কি এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজায় সহায়তা করে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *খোয়াবনামা* উপন্যাসটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই উপন্যাসের কোন কোন বিষয়গুলি বাখতিনের আখ্যানতত্ত্বের আলোকে বিচার করা যায় সেটি খতিয়ে দেখাই এর উদ্দেশ্য এবং এর বিবেচনায় এ উপন্যাসটি প্রকৃত উপন্যাসের গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছে কিনা সেটি নির্ধারণ করা। উল্লেখ্য, বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব ছাড়াও একে আরো কয়েকটি বিবেচনায় বিচার করার সুযোগ আছে যেমন — ১. মার্কসবাদ, ২. ফ্রয়েডের মনোবিকলন, ৩. বাস্তবতাবাদ, ৪. জাদু বাস্তবতাবাদ, ৫. নিম্নবর্গের ইতিহাস-চিন্তাচর্চা বা সাবলটার্ন স্টাডিজ ইত্যাদি। খোয়াবনামাকে রাজনৈতিক, আঞ্চলিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাসও বলা যেতে পারত পুরোনো ধারা শনাক্তকরণের দিক থেকে। কিন্তু বাখতিনের আখ্যানতত্ত্ব দিয়ে *খোয়াবনামার* বিচার করার ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যাও আছে। কারণ বাখতিনের আখ্যানতত্ত্ব গড়ে উঠেছে যে-

দস্তয়েভস্কির উপন্যাসকে ঘিরে, সেই দস্তয়েভস্কির উপন্যাস সম্পর্কে বাখতিন এও বলেছেন যে, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসগুলি কার্যকারণবিহীন, এর কোনো সূচনাবিন্দু নেই বা নেই কোনো পটভূমিগত ব্যাখ্যা এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলির কোনো প্রভাব এতে থাকে না। (Nadezhda, 1987 : 62) অন্যদিকে, যে বিষয়গুলি দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে নেই, ইলিয়াসের এই উপন্যাসে সেসবের প্রত্যেকটি বিদ্যমান। ইলিয়াসের এই উপন্যাস কার্যকারণসম্পন্ন, এতে সুস্পষ্ট সূচনাবিন্দু, পটভূমিগত ব্যাখ্যা এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আরো একটি দিক শনাক্ত করা যেতে পারে। গল্প-উপন্যাস লেখা ও এর বৈচিত্র্যের কোনো সীমা নেই। এছাড়াও লেখকদের দুটো ধরন আছে। এক ধরনের লেখক আছেন, যারা লেখার আগে থেকেই তাদের লেখাটিকে পড়তে পারেন, গল্পটি অর্থাৎ যে-বিষয়টি লিখবেন — সেটি লেখার আগেই জানতে পারেন। এঁরাই সেই ধরনের লেখক, যে লেখাটি লিখবেন বলে ঠিক করেন, সেটিই তাঁর মনমতো না হওয়া অব্দি এর ইতি টানেন না। গল্পের মূল অভিমুখ থেকে সরে আসেন না। আরেক ধরনের লেখক আছেন যিনি লেখা শুরু না করা পর্যন্ত জানেন না তিনি কী ধরনের গল্প লিখতে চান, অর্থাৎ গল্পটি তার জানা নেই, তিনি লিখতে লিখতে সেটি জানতে পারেন। এঁরা মূলত তাদের লেখাটিকে গল্প করে তোলেন, সেই লেখাটি লিখতে লিখতে তা অন্য রকম গড়ন পেয়ে যায়। এঁরা তাদের লেখা বা রচনাকে লিখতে লিখতে পড়তে পারেন, ফলে বার বারই এর অভিমুখ বদলে যায়। অর্থাৎ এঁরা একটি লেখা লিখতে গিয়ে আরেকটি লেখা লিখে ফেলেন। বিষয়টি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে দেবেশ রায় আরো স্পষ্ট করে দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করেছেন।

> লেখার অভিজ্ঞতা থেকেই আমি জেনে গেছি — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প বা উপন্যাস লেখার আগেই পড়তে পারতেন। আমার পড়াশুনোর মধ্যে প্রুস্ত ও দস্তয়েভ্স্কি তেমন পারতেন, কিন্তু বালজাক, তলস্তয়, ডিকেন্স, রবীন্দ্রনাথ, টমাস মান, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ লিখতে লিখতে পড়তে পারতেন। (দেবেশ, ২০১০ : ৪৫)

এদিক থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও শেষের শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হন। তাই দস্তয়েভস্কির মনোভঙ্গির দিক দিয়ে ইলিয়াস এখানেও আলাদা। এছাড়া বাখতিন যে-জায়গা থেকে দস্তয়েভস্কি পাঠ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন, সেই সমস্যাগুলি ইলিয়াসে ততটা নেই। কারণ পরিপার্শ্বহীন, পটভূমিহীন কার্যকারণহীন উপন্যাস পড়ার ভেতরে বাখতিন প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে আখ্যানের সামাজিক ভাষাতত্ত্ব (sociolinguistic studies) সমন্বয়ের যে পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন, সেদিক থেকে বিচার করলে দস্তয়েভস্কির চেয়ে ইলিয়াসের উপন্যাস-বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ।

বাখতিন যখন উপন্যাস নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা শুরু করেন, সেসময়টায় পশ্চিম ইউরোপে উপন্যাস বিষয়ক আলোচনাগুলি এর উপায়, উপকরণ তথা এর জৈব চরিত্রকে ঘিরে দানা বাঁধছিল। বাখিতন এতে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মাত্রা যোগ করেন। সেটি হলো, উপন্যাসের ওই বাচনিকতা ও উচ্চারণগত দিক। (রণবীর, ২০১১ : ৬০) এরই সঙ্গে তিনি এর প্রেক্ষাপটটিও মনে রাখেন। তিনি উপন্যাস বলতে যা বোঝেন বা বোঝাতে চান —

তার উৎস খুঁজতে চান সাহিত্যের আদিপর্বে। অন্যদিকে তাঁর মতে, উপন্যাস সব সময় মুক্ত একটি শিল্পাঙ্গিক। এটিকে কখনো সীমাবদ্ধ সংজ্ঞায় আঁটিয়ে দেওয়া চলে না। বরং ফর্মের কাঠামো অস্বীকারের প্রয়োজন থেকেই উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রয়োজন দেখা দেয়। এজন্য লিরিক বা গীতিকবিতা, এপিক বা মহাকাব্য এবং নাটকের যে কাঠামো বহুকাল ধরে নির্মিত হয়েছে, তার ছাঁচে ফেলে উপন্যাসের প্রকৃতি বা স্বরূপ চেনা যায় না। দেবেশ রায় বাখতিনের সেই দিকটি দেখিয়ে দেন, যাতে বোঝা যায় — কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের ধরনটির আলাদা হয়ে যাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। বাখতিনের বক্তব্য অনুযায়ী,

> কোনো-এক ভাষার সাহিত্যে যখনই সেই সাহিত্যের সীমা, সেই সাহিত্যের ওপর আরোপিত বাধানিষেধ, অতিক্রমণের প্রয়োজন দেখা যায় তখনই উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। একটি ভাষার সাহিত্য তৈরি হয় বিভিন্ন উচ্চারিত-অনুচ্চারিত বিধিনিষেধ আওতার মধ্যে। আর 'নভেলাইজেশন'-এর প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই যখন ঐ বিধিনিষেধগুলি বিষয়ের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫১)

এখানে বিষয়ের প্রসঙ্গটি লক্ষণীয়। বাখতিনের উপন্যাস ধারণার অন্যতম বিবেচনা, পলিফনি বা অনেকান্ত স্বর বা বহুস্বর সঙ্গতি। বলা যায়, এটি তাঁর উপন্যাস চিন্তার অভিমুখ, যেটির সূচনা হচ্ছে দ্বিবাচনিকতায়। তিনি *Problems of Dostoevsky's Poetics*-এর ভূমিকাতে উল্লেখ করেন,

> We consider Dostoevsky one of the greatest innovators in the realm of artistic form. He created, in our opinion, a completely new type of artistic thinking, which we have provisionally called *polyphonic*. This type of artistic thinking found its expression in Dostoevsky's novels, but its significance extends far beyond the limits of the novel alone and touches upon several basic principles of European aesthetics. It could even be said that Dostoevsky created something like a new artistic model of the world, one in which many basic aspects of old artistic form were subjected to a radical restructuring. The present work aims at bringing out, through theoretical literary analysis, this *fundamental* innovation of Dostoevsky. (Bakhtin, 1999 : 3)

এ বিষয়টিকে বুঝতে গেলে এর বিপরীতে থাকা ঐকান্তিকতা বা Individuality-টিকেও বুঝতে হবে। স্বাতন্ত্র্য বা অনন্যতাকে অভিন্ন বলে ভাবার ফলে ইউরোপীয় ব্যক্তিপ্রত্যয়ের যে ধারণা তৈরি হয়েছে, এতে ব্যক্তি এক মৌল সত্তা, সে শুধু স্বতন্ত্রই নয়, অন্যনিরপেক্ষ এবং একান্ত। ফলে সে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতাও বিশেষ, সেটি হলো অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। কারণ তার মতো অন্য ব্যক্তিটিও নিঃসঙ্গ এবং একক। কিন্তু মানবিক অস্তিত্বের বাইরে সে যেতে পারে না। কিন্তু ঐকান্তিক এই অবস্থান একটি বিমূর্ত অবস্থানও বটে। ফলে সেটি তাৎপর্যবিহীন। তাই "যে-সত্য ঐকান্তিক, বিমূর্ত, স্বতন্ত্র চেতনা সেখানে ভূমিকাবিহীন, অর্থাৎ যা ব্যক্তিগত তা অসঙ্গত, যা শুধুই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য তা মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সুতরাং কণ্ঠস্বরবিহীন।" (বীরেন্দ্র, ১৩৯৭ : ২০) স্যামুয়েল বেকেটের সাহিত্য ঠিক এ-জায়গাটিকে সঙ্গ দেয়। এক

তাৎপর্যহীনতা, যোগাযোগহীনতাই তার অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে বিমূর্ত। কারণ সেটি ইউরোপীয় সমাজমানসের অনিবার্যতা নিয়ে আগেই দেখা দিয়েছে। বেকেট এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র। তাই বেকেটের সাহিত্য "যোগাযোগের ভাষার ব্যর্থতা বা যোগের চেয়ে বেশি অযোগের ভাষার সার্থকতা দেখাতে তৎপর।" (বীতশোক ও সুবল, ২০০৭ : ১) ঠিক এ জায়গাটি ইলিয়াস ধরিয়ে দেন এভাবে,

> মূলধারার মানুষ মূলত বিচ্ছিন্ন মানুষ। ব্যক্তিস্বাধীনতার ডঙ্কা পিটিয়ে বুর্জোয়া সমাজের উদ্ভব, অন্যের শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির এই বহু ঘোষিত স্বাধীনতা রূপ নেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এবং পুঁজির সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখে সর্বাঙ্গ ঢুকিয়ে দিয়ে আজ এর পরিণতি ঘটেছে আত্মসর্বস্বতায়, এখন ঐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নাম করা যায় ব্যক্তিসর্বস্বতা। ব্যক্তিসর্বস্বতা দিয়ে চিহ্নিত সমাজও যে-শিল্প সৃষ্টি করে তা দিনদিন স্যাঁতসেতে হয়ে আসছে রুগ্ন ও রোগা এক ব্যক্তির কাতরানিতে। এই রুগ্ন লোকটির ভেতরটা ফাঁকা ও ফাঁপা। (ইলিয়াস, ১৯৯৭ : ১৪৩)

ইলিয়াসের সাহিত্য এই ব্যক্তিসর্বস্বতার বিরুদ্ধের সাহিত্য। ফলে তাঁর অবস্থান বাখতিনের আখ্যানতত্ত্ব এবং বেকেটের সাহিত্যচেতনার মাঝামাঝি। কারণ তাঁর উপন্যাসের ব্যক্তি বেকেটের গল্প-উপন্যাস-নাটকের হাজির করা ব্যক্তির মতো কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। ব্যক্তি সেখানে সমাজসত্তা নিয়ে উপস্থিত। অন্যদিকে বাখতিনের তত্ত্ব অনুযায়ী দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে মূলত ব্যক্তির মাধ্যমেই পলিফনি তৈরি হওয়ার বিপরীতে ইলিয়াসের উপন্যাসে সমষ্টিই সেই পলিফনির জন্ম দেয়। একারণে ব্যক্তির প্রাধান্যের চেয়ে তার সমাজমানসের সন্ধান সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে। যদিও এতে একদিকে যেমন ব্যক্তি সমাজকে, অন্যদিকে তেমনি সমাজও ব্যক্তিকে তৈরি করে। সমাজের মাধ্যমে সে নিয়ন্ত্রিত হয়, সমাজকেও সে নিয়ন্ত্রণ করে। সবচেয়ে বড় কথা রাজনীতি ও অর্থনীতির সুস্পষ্ট জালচক্রের ভেতর দিয়ে ব্যক্তির এই দ্বৈত অবস্থান তাঁর উপন্যাসে উঠে আসে, যেটি দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে প্রচ্ছন্ন থাকে, যদিও দ্বৈধতা তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে ইলিয়াসের উপন্যাসে যে-সংঘর্ষ তৈরি হয়, সে জন্য পাঠক উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে মিশে যান না। সবসময় সর্তক থাকেন যে তিনি একটি উপন্যাস পড়ছেন। পাঠক নিজে এর ভেতরে প্রবেশ করেন না। বিষয়টি-যে উপন্যাসেই ঘটছে, — উপন্যাসের গড়ন তাকে এব্যাপারে সচেতন করে রাখে। ফলে যে দ্বিবাচনিকতা এবং অনেকান্ত স্বর বাখতিনের উপন্যাসভাবনার মূল দুটো দিক, সেটি ইলিয়াসে দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে থাকা ব্যক্তির মতো দেখা দেয় না। অন্যদিকে বাখতিন দেখান পলিফনি বা অনেকান্ত স্বরে একটি মন অন্য মনকে পড়ে চলে এবং অন্যদিকে এর পাঠকও এর অংশ হয়ে ওঠেন। বাখতিনের মতে,

> In Dostoevsky's polyphonic novel we are dealing not with ordinary dialogic form, that is, with an unfolding of material within the framework of its own monologic understanding and against the firm background of a unified world of objects. No, here we are dealing with an ultimate dialogicality, that is, a dialogicality of the ultimate whole. The dramatic whole is, as we have pointed out, in this respect monologic; Dostoevsky's novel is dialogic. It is constructed not as the whole of a single consciousness, absorbing other consciousnesses as objects into itself, but as

> a whole formed by the interaction of several consciousnesses, none of which entirely becomes an object for the other; this interaction provides no support for the viewer who would objectify an entire event according to some ordinary monologic category (thematically, lyrically or cognitively) — and this consequently makes the viewer also a participant. (Bakhtin, 1999 : 18)

এই সঙ্গে বাখতিন প্রথমে দস্তয়েভস্কির বৈশিষ্ট্য বা মনোভঙ্গিটি তার নোটবুক থেকে তুলে ধরেন এবং এরই সূত্রে তাঁর তিনটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেন —

> Dostoevsky defined in his notebook the distnguishing features of his realism in this way :
> "With utter realism *to find the man in man* ... They call me a *psychologist; this is not true.* I am merely a realist *in the higher sense,* that is, I portray all the *depths of the human soul.*"
> We will have occasion to return more than once to this remarkable formula. But at this point it is important to emphasize three of its aspects.
> First, Dostoevsky considers himself a realist, but not a subjective romantic trapped in the world of his own consciousness. He solves his *new* task — "portraying all the depths of the human soul" — with "utter realism," that is, he sees these depths *outside* himself, in the souls of *others.*
> Second, Dostoevsky believes that this *new* task cannot be adequately performed by realism in the usual sense, that is, by what is in our terminology *monologic* realism; what is needed here is a special approach to the "man in man," that is, a "realism in the higher sense."
> Third, *Dostoevsky categorically denies that he is a psychologist.* (Bakhtin, 1999 : 60-61)

ফলে আমরা দেখি দস্তয়েভস্কি নিজেকে একজন বাস্তবতাবাদী মনে করেন, কিন্তু তাঁর এই বাস্তবতাবাদ প্রচলিত বাস্তবতাবাদ উতরে আরেকটি উচ্চতর অর্থে ও স্তরে যেতে চায় এবং তিনি কোনো মনস্তত্ত্ববিদ নন — সেটিও ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর লেখার ভেতরে মনোবিশ্লেষণের দিকগুলি সহজেই চোখে পড়ে। আর সেটি ঘটে সংলাপের সূত্রে, যে সংলাপের প্রবাহ একটি স্বরের ভেতরে দিয়ে অনেক বিষয় তুলে নিয়ে আসে, হয়ে ওঠে অনেকান্ত স্বর।

সবমিলিয়ে বাখতিনের আখ্যানতত্ত্বের দুটো দিক বারবারই দস্তয়েভস্কির উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে উচ্চারিত হয়েছে

১. দ্বিবাচনিকতা বা ডায়লগ।
২. অনেকান্ত স্বর/বহুস্বর সঙ্গতি বা পলিফনি।

এই দুটো বিষয়ই বাখতিন তুলে নিয়ে আসেন গ্রিকদের 'স্পাউদোগেলোয়াস' — গভীর হাস্যকৌতুকময় সাহিত্য, যাকে সিরিওকমিক বলা যেতে পারে। এতে সোফ্রেন-এর মূকনাট্য, সক্রেটিসের সংলাপ, সিমপোসিয়াস্টদের রচনা, আদি স্মৃতি-কথা, মেনিপ্পিয়ান

ব্যঙ্গনাট্যসহ নানান অনুষঙ্গ যোগ হয়। বাখতিন এই রচনাগুলির নাম দিয়েছেন 'কার্নিভালাইজড লিটারেচার'। আদতে মেনিপ্পিয়ান সাহিত্যের ধারা ধরেই ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈশ্বিক মাত্রায় উন্নীত হওয়ার লক্ষণগুলি পরিস্ফুট —

> Carnivalization even penetrates the deepest philosophical and dialogic core of the menippea. Characteristic for the genre, as we have seen, is a naked posing of ultimate questions on life and death, a universalism of the most extreme sort (personal problems and elaborate philosophical argumentation are unknown to it). Carnivalistic thought also lives in the realm of ultimate questions, but it gives them no abstractly philosophical or religiously dogmatic resolution; it plays them out in the concretely sensuous form of carnivalistic acts and images. Thus carnivalization made possible the transfer of ultimate questions from the abstractly philosophical sphere, through a carnival sense of the world, to the concretely sensuous plane of images and events — which are, in keeping with the spirit of carnival, dynamic, diverse and vivid. A carnival sense of the world also made it possible to "deck out philosophy in the motley dress of a hetaera." A carnival sense of the world is the drive-shaft between the *idea* and the *artistic image of adventure.* A vivid example of this in European literature of modern times are the philosophical novellas of Voltaire, with their universalism of ideas, their carnivalistic dynamism and motley colors *(Candide,* for example); in very graphic form these novellas reveal the traditions of the menippea and carnivalization. Carnivalization thus penetrates to the very philosophical core of the menippea. (Bakhtin, 1999 : 134)

কার্নিভাল মেনিপ্পিয়ান সাহিত্যের গভীরতমর দার্শনিক ও দ্বিবাচনিক ভূমিকাটিকে হাজির করে; কিন্তু তা কেবল একটি কালে বা স্থানের সীমায় পড়ে থাকে না। জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে এ এক বৈশ্বিক জিজ্ঞাসার উন্মোচন ঘটাতেও কাজ করে। এটা কোনো বিমূর্ততায় নয়, এর জীবন্তভাবের কারণেই আখ্যানের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে থেকে গেছে। কার্নিভালে উপজীব্য কয়েকটি বিষয় এভাবে শনাক্ত করা যায় —

ক. হাসি বা হাস্যরস।
খ. উদ্ভট উপাদান বা উদ্ভট বাস্তবতাবাদ।
গ.বিদ্রূপ ও শ্লেষ।
ঘ. দ্রোহ ও প্রতিরোধ।
ঙ. বিস্ময়বোধ সৃষ্টি। (তপোধীর, ২০০৯ : ৯০-১০০)

ফলে সাহিত্যে কার্নিভাল একটি সক্রিয় বৈশিষ্ট্য এবং এর লক্ষণ দেশকালের সীমা পেরিয়ে প্রায় সর্বত্র পরিস্ফুট। জীবনকে সরস ও গতিময় রাখতে একে যেকোনো রচয়িতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহার করে ফেলেন। কিন্তু এর ভূমিকা তারও বেশি। কারণ,

> কার্নিভাল কেবল সাহিত্যিক কৃৎকৌশল নয়; কার্নিভালের ধারণায় রয়েছে মুক্ত পরিসর, রয়েছে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক অন্তঃস্বর। সর্বত্র-ব্যাপ্ত আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা জানাতে গিয়ে ঐ মুক্ত পরিসরের সম্ভবনাকেই কাজে লাগাতে হয়। পাঠকৃতির নিজস্ব রাজনীতি রয়েছে,

> রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিকতার নানা আয়োজন। সেখানে হস্তক্ষেপ করতে হলে মনে রাখতে হয় যে পাঠকৃতিও যুদ্ধক্ষেত্র; লেখা ও পড়া — দু'টি ক্রিয়াই মূলত যুদ্ধ। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমস্ত তাৎপর্য অর্জনীয় বলেই লেখার কার্নিভালিকরণ যা ঘটিয়ে দেয়, তা যুগপৎ নান্দনিক ও রাজনৈতিক উন্মোচন। (তপোধীর, ২০০৯ : ৯০)

খোয়াবনামায় ঠিক এই বিষয়টি প্রবলভাবে ঘটেছে। কৌতুক ও ক্রোধের শক্তি মিলে এই উপন্যাসের নান্দনিক ও রাজনৈতিক উন্মোচন সম্পন্ন করেছে।

বাখতিন বলেছেন, — এই কার্নিভাল সাহিত্যের মধ্যে বিশেষত সক্রেটিসের সংলাপ ও মেনিপ্পিয়ান ব্যঙ্গনাট্য উপন্যাসের একটি উৎস। সেই উৎসের সঙ্গে দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের সম্পর্ক। সেখান থেকেই এই উপন্যাসের দ্বিবাচনিকতার (ডায়ালজিক) ধরন এসেছে আর সেই সংলাপ বৈচিত্র্য থেকেই এসেছে বহুস্বরসঙ্গতি বা 'পলিফনি'। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫৪)

বাখতিন মেনিপ্পিয়ান স্যাটায়ারকে ধরে চৌদ্দটি ধারায় এর বৈশিষ্ট্যগুলি হাজির করেছেন। (Bakhtin, 1999 : 114-118)-এর শেষটি অর্থাৎ চৌদ্দতমটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে —

> Finally, the last characteristic of the menippea: its concern with current and topical issues. This is, in its own way, the "journalistic" genre of antiquity, acutely echoing the ideological issues of the day. The satires of Lucian, taken as a group, are an entire encyclopedia of his times: they are full of overt and hidden polemics with various philosophical, religious, ideological and scientific schools, and with the tendencies and currents of his time; they are full of the images of contemporary or recently deceased public figures, "masters of thought" in all spheres of societal and ideological life (under their own names, or disguised); they are full of allusions to the great and small events of the epoch; they feel out new directions in the development of everyday life; they show newly emerging types in all layers of society, and so on. They are a sort *of Diary of a Writer,* seeking to unravel and evaluate the general spirit and direction of evolving contemporary life. (Bakhtin, 1999 : 118)

এই বিষয়টিই আদতে ইলিয়াসের *খোয়াবানামার* প্রধানতম দিক হিসেবে দেখা দেয়। কেন ও কীভাবে সেটি দেখা দিয়েছে তা আলোচনাক্রমে উপস্থাপিত হবে। এখানে কেবল বলা যায়, যেকোনো দেশের লোকজীবনের গভীর থেকে সাহিত্য উপকরণ গ্রহণ করলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্নিভালীয় বৈশিষ্ট্য পেয়ে যায়। মেনিপ্পিয়ান সাহিত্যের গঠন-গড়নে লোকজ সংস্কৃতির ভূমিকা প্রধান। বাখতিন মেনিপ্পিয়ান সাহিত্যে প্রধান বৈশিষ্ট্যের সবই দস্তয়েভস্কির সাহিত্যে আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কার করেছেন। দস্তয়েভস্কির সাহিত্যের সঙ্গে এর আশ্চর্যজনক মিল। দেবেশ রায়ের মতে, "এ দুইয়ের জগৎ আসলে একটাই জগৎ; যদিও মেনিপ্পিয়ানে যার শুরু, দস্তয়েভস্কিতে তার পরিণতি।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫৪)

এরই সূত্রে বাখতিন নির্দেশ করেন যে, উপন্যাস বলতে যা বোঝায় এর লক্ষণ অনেক আগেই প্রকাশ পেয়েছিল। বাখতিন উপন্যাস বা উপন্যাসের ইতিহাস খুঁজেছেন সাহিত্যের

স্বীকৃত ইতিহাসের চৌহদ্দির বাইরেই কেবল নয়, বরং তার বিপরীত প্রক্রিয়ায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যা সাহিত্যের ইতিহাসে অবমূল্যায়িত, সেখানে — মধ্যযুগীয় নাইটদের রোমন্সে বা রাখালিয়া কাব্য আখ্যানের বা আবেগময় কাহিনি প্যারোডিতে। সার্ভেন্তিস, স্টার্ন বা ফিল্ডিংয়ে এই প্যারোডির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে — বাখতিন জানান, এই প্যারোডি চলে আসছে গ্রিসের সেই আদি সাহিত্য থেকে। কখনো স্বীকারোক্তিতে, কখনো কল্পকথায়, কখনো ব্যঙ্গবিদ্রূপে — এই 'নভেলাইজেশন' ঘটে চলেছে। কথোপকথন ভঙ্গির জন্য বাখতিন সক্রেটিসকে আদি-ঔপন্যাসিকই বানিয়ে ফেলেন। তাঁর সেই ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষের যুক্তিকে নিজের যুক্তি হিসেবে উপস্থিত করার সচেতন ভঙ্গির ভেতর দিয়ে তার একার কণ্ঠস্বর একটি বিষয়ের বহুপক্ষ তৈরির ক্ষমতা অর্জন করে বলেই এই মনে হওয়া। পরবর্তীকালে তিনি বায়রনের দীর্ঘ কাব্য 'চাইল্ড হেরাল্ড' ও 'ডন জুয়ানে', ইবসেনের নাটকে, হাইনের লিরিকে 'নভেলাইজেশন' খুঁজে পান। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫২) এই নভেলাইজেশনের সর্বোত্তম প্রকাশ যে দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে ঘটেছে একে তিনি আবার অভূতপূর্ব বলেও মনে করেন না। কিন্তু নভেলাইজেশন বলতে তিনি যা বোঝেন তার শুদ্ধতম প্রকাশ ঘটেছে দস্তয়েভস্কির রচনায় — সেটি তাঁর দিক থেকে নিশ্চিত করেই তিনি মনে করেন। এছাড়াও তিনি দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের ভেতর দিয়ে যুগপৎ উপন্যাসের প্রকৃত ইতিহাসে এবং উপন্যাসের সত্তার মূল দিকটি হাজির করেন। এ কারণেই বাখতিনের আখ্যানতত্ত্ব এমন বৈপ্লবিক।

বাখতিনের কাছে উপন্যাস তাই একটি মাত্র সাহিত্যরূপ নয়, এটি এ সময়ের সাহিত্যের বিকাশের প্রধান বিষয়। আর সাহিত্যের ইতিহাসের আদিকালে সবচেয়ে সক্রিয় অন্তর্ঘাতী শক্তি। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫২) এই অন্তর্ঘাতী শক্তিটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর *খোয়াবনামায়* কাজে লাগিয়েছিলেন যেভাবে — তাতে বাখতিনের আখ্যানতত্ত্ব কতটা প্রযোজ্য হতে পারে — এবার সেদিকে নজর দেওয়া যাক।

২. বাখতিনের আখ্যানতত্ত্বের আলোকে ইলিয়াসের খোয়াবনামা

বাখতিনের আখ্যানতত্ত্ব আসলে উপন্যাস বিষয়ক তত্ত্ব। এ কারণে দেখা যায়, আধুনিক আখ্যানতত্ত্বের ইতিহাসের বেশ কিছু দিক বাখতিনের প্রভাবে তৈরি হলেও তাঁর ঠাঁই সেখানে মেলেনি। কারণ আখ্যানতত্ত্বের নামে যে-ব্যবস্থা এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব — দুটোর কোথাও বাখতিন খুঁটি গাড়েন না। তিনি এর বৌদ্ধিকজগতে ইতস্তত ভ্রমণ করেন মাত্র। (রণবীর, ২০১১ : ৫২) তাঁর এই যাযাবরবৃত্তির কারণে তিনি সেখানে এক রকম অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু তাঁর তৈরি শব্দগুলি (dialogue, dialogism, heteroglossia) আখ্যানতত্ত্বের নিজস্ব হয়ে গেছে, তারপরও আখ্যানতত্ত্বের কারবারিদের কাছে বাখতিন আখ্যানতাত্ত্বিক হিসেবে বিবেচ্য হন না। এর কারণ রুশ অবয়ববাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর মূল অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা তাঁদের সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের নির্মাণে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়েছেন। ভাষা ও সাহিত্য তাঁদের হাতে ইতিহাস-বর্জিত। (রণবীর, ২০১১ : ৫২-৫৩) ইতিহাসকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ করে বাখতিন নিজেই বাদ পড়েছেন ইতিহাস থেকে। বাদ পড়ে গিয়েও ফিরে এসেছেন মৃত্যুর পরে পরে। পরবর্তীকালে

আখ্যানতত্ত্বের নানান বিবেচনায় তাঁর প্রভাব কাজ করেছে। মার্কিন উদার-মানবতাবাদী বাখতিন, উত্তর-নির্মিতিবাদী বাখতিন, বস্তুবাদী বাখতিন, নারীবাদী বাখতিন, আফ্রিকান-আমেরিকানিস্ট বাখতিন, উত্তর-ঔপনিবেশিক বাখতিন, উত্তর সোভিয়েত খ্রিস্টীয় বাখতিন — এমন নানান তকমায় বাখতিন জুড়ে গেছেন। এসবই তাঁর তত্ত্বের বিশেষ শক্তির জন্য ঘটেছে এবং তাঁর সেই তত্ত্বচর্চায় ভূমিকা পালন করেছেন জুলিয়া ক্রিস্তেভার মতো তাত্ত্বিক। জুলিয়ার মাধ্যমেই আশির দশকে, বাখতিনের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মার্কিন মুলুকে এবং নিজ দেশ রাশিয়ায় তিনি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান।

বাখতিন যে-অভিযোগের কারণে আখ্যানতত্ত্বের ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিলেন — সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের নির্মাণে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দেওয়ার কারণে, সেটিই তাকে এমন বহুমুখী করে তুলেছে। তিনি আখ্যানতত্ত্বের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকেও প্রভাবিত করছেন, একই সঙ্গে এর খ্রিষ্টীয় ভাববাদী ব্যাখ্যাতেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে। যে-ডায়লজি বা দ্বিবাচনিকতা ও পলিফনি বা বহুস্বর সঙ্গতির কথা বাখতিন দস্তয়েভস্কির উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন, তাঁর সেই তত্ত্ব উপন্যাস ও আখ্যানসংক্রান্ত সব তত্ত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতে পারে। আর এর ফলে তৈরি হয় তত্ত্বেরই নতুন দ্বিবাচনিকতা। উত্তর-ঔপনিবেশিক বিচার বিবেচনায়ও তাঁর তত্ত্বের সাহায্য পাওয়া যায়; সেই সঙ্গে থাকে সমাজ ও ইতিহাসের যোগ। এই দিক থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামার* আখ্যানভাগ বিচার করে বোঝা যায়, উপন্যাস হিসেবে এর শক্তি ও দুর্বলতা।

আখ্যানতত্ত্ব নামের ধারণাটি গঠনবাদ বা স্ট্রাকচারালিজম থেকে উদ্ভূত। (Barry, 2001 : 214) কিন্তু পরে এটির চর্চা ভিন্ন এক বিস্তৃতি লাভ করেছে। আর অবয়ববাদ প্রথমে ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুরের ভাষা বিষয়ক ধ্যানধারণাজাত। বাখতিন দেখেছিলেন সেটি সামাজিক অভিজ্ঞতা ও পরিপ্রেক্ষিতহীন। (Macey, 2011 : 28) আগেই বলা হয়েছে, তাঁর মতে,"বিভিন্ন সামাজিক বাক্‌রীতি ও ব্যক্তিক স্বরের শিল্পসম্মত বিন্যাস"-ই উপন্যাস নির্মাণ করে। তাহলে মূল দিকটা হলো ওই বিষয়গুলিকে শিল্প করে তোলা। কারণ সামাজিক বাক্‌রীতি ও ব্যক্তিক স্বর তৈরি করা কঠিন কিছু নয়। মূল সমস্যাটা তৈরি হয় সেটিকে শিল্প করে তোলার ভেতরে। বাখতিন এই কারণে অর্থের বহুবাচনিক গুণ (plural quality of meaning)-টিকে দেখতে পান। আদতে এটা তো পরিষ্কার যে অর্থ (মিনিং) এবং সংলাপ (ডায়লগ) এই দুয়ের প্রথমটি সমাজে নিহিত, মানে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস বা পরিপ্রেক্ষিত ভাষাকে নানান অর্থ দেয়, অন্যদিকে সংলাপ তৈরি হয় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং বিচিত্র ব্যক্তির আলাপের ভেতর দিয়ে — দুয়ে মিলে তৈরি হয় আখ্যান। তাই আখ্যান মানেই দ্বিবাচনিক একটা ব্যাপার, আর তা হয়ে ওঠে একই সঙ্গে বহুস্বরের সমন্বয়। ইলিয়াসের *খোয়াবনামাকে* এই নিরিখে নতুন একটি মাত্রায় দেখে নেওয়া যেতে পারে।

ইলিয়াস একটি বিলকে কেন্দ্র করে একাধিক ঘটনা ও গল্পের সন্নিবেশে যে-উপন্যাসের নাম রাখেন *খোয়াবনামা* তা আসলে দেশভাগের আগে ও পরের সমাজ ও শ্রেণিবাস্তবতার প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাখানমালায় পরিপূর্ণ। *খোয়াবনামায়*

> গল্পের আখ্যান তো একটি নয়, অনেক কটি গল্প এ ওর পেটে ঢুকে বসে আছে; তবু স্পষ্টত দু'রকমের কাহিনী তৈরি হয়ে ওঠে। একটি লৌকিক সংসারের কথকতা, যেখানে স্বার্থে কূটবুদ্ধি, বিত্তসঞ্চয়, পরস্বাপহরণ, প্রবঞ্চনা ও খুনজখম; আর অন্যটি একান্তই স্বপ্নাচ্ছন্ন এক ভুবন যা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার, সারল্য ও বুদ্ধিহীনতা, অলৌকিকে আস্থা ও সাত্ত্বিক ঔদার্য, আবার একইসঙ্গে অন্যের বুদ্ধিতে নীচপন্থায় চালিত হওয়া — সব মিলেমিশে শীতের মাঠে কুয়াশা-আস্তরণে ঢাকা চাঁদনি রাত যেন, অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতা অন্য গোত্রের বৈভব হাঁকায়। (হায়াৎ, ২০০০ : ৩১০)

তাহলে দেখা যাচ্ছে *খোয়াবনামার* এক দিকে আছে বাস্তবতার জগৎ, অন্য দিকে আছে স্বপ্ন ও আচ্ছন্নতার জগৎ। উপন্যাসটির প্রতি পরতে পরতে আছে স্বপ্ন ও বাস্তবতার সংযোগের ইঙ্গিতও। এর সূচনাই হয় আচ্ছন্নতা দিয়ে, কিন্তু সেখান লক্ষণীয় যে, উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র তমিজের বাপের পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে আছে —

> পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে যেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলার রগ টানটান করে যতটা পারে উঁচুতে তাকিয়ে গাঢ় ছাই রঙের মেঘ তাড়াতে তমিজের বাপ কালো কুচকুচে হাত দুটো নাড়ছিল, ঐ জায়গাটকে ভালো করে খেয়াল করা দরকার। (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ৯)

এখানে খেয়াল করতে যায় যে, তমিজের বাপ যতই মেঘ তাড়িয়ে মুনসির অবস্থান দেখতে চাক, যতই ঘুমের ঘোরে হাঁটুক, তার পা সব সময় মাটিতেই। তেমনি এর উল্টাদিকে আছে পাকুড়গাছে থাকা মুনসির বিল শাসনের কথা এবং সেই সঙ্গে আসে তার রূপান্তরের কথাও —

> সবখানে মুনসির ইচ্ছামতো বিচরণ। সবাইকে একটি লহমার জন্যে এক জায়গায় ঠাঁই করে দিয়ে জাল নিয়ে সে উড়াল দেবে উত্তরের দিকে। বাঙালি নদীর পথভোলা রোগা একটি স্রোত এসে মিশেছে সেখানে, কাৎলাহার বিলে। বিলের শিওরে পাকুড়গাছে বসে সকাল থেকে শকুনের চোখের মণি হয়ে ঢুকে মুনসি সূর্যে আকাশ পাড়ি দেওয়া দেখবে, দেখতে দেখতে হঠাৎ রোদে মিশে গিয়ে রোদের সঙ্গে রোদ হয়ে ওম দেবে বিলের গজার আর শোল আর রুই আর কাৎলা আর পাবদা আর ট্যাংরা খলসে আর পুঁটির হিম শরীরে। আর হয়রান হয়ে পড়লে পাকুড়গাছের ঘন পাতার আড়ালে কোনো হরিয়াল পাখির ডানার নিচে ছোটো একটি লোম হয়ে নরম মাংসের ওমে টানা ঘুম দেবে সারাটা বিকাল ধরে। (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ১১)

এই কথাকটি প্রথম পরিচ্ছেদেই আরো একবার এবং উপন্যাসে আরো দুইবার উল্লেখ করা হয়। বার বার ফিরে আসে মুনসির কথা। মুনসির কথা, চেরাগ আলি ফকিরের কথা ধ্রুবপদের মতো বারবার হাজির করলেও এর সঙ্গে তমিজের জেগে থাকা, মাঝি বংশের ছেলে হয়ে চাষা হয়ে ওঠার স্বপ্ন, তেভাগার জন্য আকুলতাও বার বার উচ্চারিত হয়; আর উচ্চারিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এবং তার বাস্তবতা। এই চলে এর ৩৯ পরিচ্ছেদ অব্দি।

ইলিয়াস উপন্যাসটিকে 'প্রথম পর্ব' ও 'দ্বিতীয় পর্ব' — এভাবে ভাগ করে দেননি। কিন্তু স্পষ্টত বোঝা যায় যে, ১ থেকে ৩৮ পর্যন্ত পরিচ্ছেদ এর 'প্রথম পর্ব' এবং এর শেষাংশ অর্থাৎ ৩৯ থেকে ৫৯ পরিচ্ছেদ হল এর 'দ্বিতীয় পর্ব'। প্রথম পর্বটি পাকিস্তানের স্বপ্ন, আর দ্বিতীয় পর্বটি সেই স্বপ্নভঙ্গের বাস্তবতা। এই দুই পর্বেই নানান ঘটনা একইভাবে

ঘুরে ফিরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাস বাঁটার মতো করে বেঁটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের এই দুই আবহ তাতে অক্ষুণ্নই থেকে গেছে। আর এরা তৈরি করেছে বিশেষ ধরনের সংলাপ বিনিময়ী আখ্যানমালা। যেন একটি পর্ব অন্যটিকে ব্যঙ্গ করেছে বার বার। বাখতিনের সংলাপতত্ত্বের ও দ্বিবাচনিকতার সূত্রেই এই শনাক্তকরণ সম্ভব হলো। এছাড়াও উপন্যাসে আছে একদিকে ঘুমের জগৎ, অন্যদিকে জেগে থাকার জগৎ। তমিজের বাপ হলো ঘুমের জগতের প্রতিনিধি, আর তমিজ করেছে জেগে থাকা জগতের প্রতিনিধিত্ব। ফলে স্বপ্ন ও বাস্তবতা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ এবং ঘুম ও জেগে থাকার জগতের ভেতরে, সেই সঙ্গে শ্রেণিবিন্যাস ও শ্রেণিবাস্তবতার নানান উল্লেখ এখানে তৈরি করেছে বিচিত্র রকমের দ্বিবাচনিকতা এবং তাতেই সৃষ্টি হয়েছে বহুস্বর সংগতি ও পলিফনি।

উপন্যাসে থাকা কিছু বিষয় ও মানুষ বার বারই ফিরে ফিরে এসেছে। মূলত এঁদের ও এগুলিকে ঘিরেই আখ্যানগুলি সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের প্রধান কয়েকটি — ১. তমিজের বাপ, ২. কাৎলাহার বিল, ৩. মুনসি বয়তুল্লাহ শাহ, ৪. শরাফত মণ্ডল ও তার পরিবার, ৫. তমিজ, ৬. কুলসুম, ৭. হুরমতুল্লা, ৮. ফুলজান, ৯. চেরাগ আলি ফকির ও তার গান, ১০. খোয়াবনামার বই, ১১. মুসলিম লীগ ও এর নেতাকর্মী, ১২ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ড, ১৩. তেভাগা আন্দোলন ও এর গান, ১৪. ব্রিটিশ শাসন আমল, ১৫. ভবানী পাঠক, ১৬. বৈকুণ্ঠ গিরি, ১৭. কালাম মাঝি ও তার পরিবার, ১৮. কেরামত আলি, ১৯. জাতপাত, ২০ হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সংস্কার, কুসংস্কার ও অসন্তোষ, ২১ দাঙ্গা, ২২ দেশভাগ — এঁদের ঘিরেই তৈরি হয়েছে *খোয়াবনামার* স্বপ্ন ও বাস্তবতার ভূমি গিরিরডাঙা ও নিজগিরিরডাঙা এলাকা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাখতিনের তত্ত্বে এভাবে *খোয়াবনামাকে* পাঠ করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি উঠে আসে তার হলো এতে থাকা কার্নিভাল। এতে করে এই উপন্যাস একটি সিরিওকমিক আদলও পেয়ে যায়। কারণ যেমাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে সাধারণ মানুষ ও দরিদ্র মুসলমান কৃষকের জীবনে কী কী উন্নতি হবে — সেটি পড়া মাত্র পাঠক উপলব্ধি করবেন।

শরাফত মণ্ডলের নাতি হুমায়ুনের চল্লিশার আয়োজনের সূত্রে ছোটমিয়া, আসিরুদ্দিন ও কাদের আলাপচারিতার জায়গাটি ইলিয়াস যেভাবে আনেন, সেটি পড়তে পড়তে, পাকিস্তানের যে স্বপ্ন বা সম্ভাবনার কথা এতে হাজির করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা বাস্তবে কীসে পরিণত হয়েছে *খোয়াবনামা* উপন্যাসে তার অভিমুখটি দেখা যায়। ছোটমিয়া, ডাক্তার আসিরুদ্দিন ও কাদেরের সেই আলাপ ছিল হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নিয়ে —

> 'গভর্নমেন্ট তো মুসলিম লীগের। লীগ তো বেঙ্গল রুল করছে অনেক দিন। এক ফেমিন ছাড়া এদের বড়ো কীর্তি আর কী বলেন তো'?
> 'এই তো ঠিক পয়েন্টে আসলেন'। ছোটমিয়াকে জুতমতো ধরা গেছে এমন ভাব করে ডাক্তার, 'ফেমিনের সময় বেঙ্গল গভর্নমেন্ট চাল চাইলো বিহারের গভর্নমেন্টের কাছে, হিন্দু ডমিনেটেড কংগ্রেস গভর্নমেন্ট না করে দিলো। এখানকার হিন্দু লিডাররা পুরো সায় দিলো বিহারকে।

ওয়ারের নাম করে বৃটিশ সব চাল গায়েব করে দিলো। বদনাম হলো মুসলিম লীগের। পাকিস্তান হলে হেলপ করবে গোটা ইনডিয়ার মোসলমানরা। মোসলমান বিজনেস কমিউনিটি হেলপ করার স্কোপ পাবে, মোসলমান জমিদার যারা আছে তারা এখন কী হেলপ করছে? হিন্দু জমিদার ছাড়া দেশে স্কুল কলেজ হতো? এই ডিস্টিক্টে এক জেলা স্কুল ছাড়া আর সবই হিন্দু জমিদারদের দান। টাউনে তো বড়ো বড়ো জমিদার দুজনেই মোসলমান, কোনো স্কুল কলেজের জন্যে একটা ইট দিয়েছে কেউ?'
'ডাক্তার সাহেব, এসব কাজ করতে আলাদা মেন্টালিটি লাগে, বুঝলেন'?
'মেন্টালিটি তৈরি হবে পাকিস্তান হলে। নিজের দেশে পাওয়ার থাকবে নিজেদের হাতে, মুসলমান জমিদারদের তখন সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি গ্রো করবে'।
কিন্তু ডাক্তারের এই কথায় কাদেরের সায় নাই, সে বরং প্রতিবাদ করে,'পাকিস্তানে জমিদারি সিস্টেম উচ্ছেদ করা হবে। বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ করা হবে। পাকিস্তানে নিয়ম হবে জমি তার লাঙল যার। পাকিস্তানে আমিরে গরিবে ফারাক থাকবে না'। (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ৯৯)

সেই কাদেরই তমিজ যখন তার চাষ করা ধানের হিসাবে কম পড়ায় অনুযোগ করে, তমিজের পক্ষে শক্তভাবে দাঁড়াতে পারে না। এছাড়া পাকিস্তান হওয়ার পর যে ফারাক থাকবে না বলে জোর গলায় বলা হয়েছিল, পরে সেই পাকিস্তানে কী হয়েছিল, সেই ইতিহাস সাধারণভাবে যারা জানেন তাদের কাছে পাকিস্তানের নামে বলা কথাবার্তাগুলি রীতিমতো হাস্যকর হয়ে ওঠে না কি? পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শোর তুলে যে বিরাট প্রতারণার ফাঁদ তৈরি হয়েছিল *খোয়াবনামায়* স্পষ্ট করে দেখা যায় এর প্রক্রিয়াগুলি। আর সেই প্রক্রিয়াগুলি এ উপন্যাসকে সিরিওকমিক করে তোলে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে এর কার্নিভালীয় বৈশিষ্ট্য।

এসব প্রসঙ্গে বিস্তারিত যাওয়ার আগে কয়েকটি বিষয়ে একটু নজর দেওয়া যাক। যেমন উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে র‍্যালফ ফক্স লেখেন, "উপন্যাস হলো আমাদের সভ্যতার এক মহান লোকশিল্প, মহাকাব্যের একমাত্র উত্তরসূরী।" (বদিউর, ২০০৫ : ১৭) এখানে মহাকাব্য নিয়ে বাখতিনের মত হলো,

The epic world is constructed in the zone of an absolute, distanced image beyond the sphere of possible contact with the developing, incomplete and therefore rethinking and revaluating present. (Bakhtin, 1981 : 17)

সেদিক থেকে খোয়াবনামার আখ্যান একটি স্থিরীকৃত অতীতের পটভূমিতে দাঁড়ানো। কিন্তু এটিকে বর্তমানে নতুন করে বারবার নানাভাবে পাঠ করার ভেতর দিয়ে এটি সম্পূর্ণতা পেতে পারে।

শুরুর পরিচ্ছিদের এই আবহকে অলৌকিক হিসেবে দেখার যুক্তিটি উপন্যাসের পরের অধ্যায়গুলিতে স্পষ্ট হয়। তমিজের বাপের এই মেঘ তাড়ানোর প্রয়াস ও মুনসিকে খুঁজে চলার বিশ্বাস তার একার নয়, ওই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীরও বিশ্বাস। প্রত্যক্ষ বস্তুগত বাস্তবতার দেহে মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটির উপরপাচন এর আখ্যানের অদৃশ্য শক্তি হিসেবে উল্লেখ করাটাও তাই যথাযথ। (হায়াৎ, ২০০০ : ৩১৩)

একদিকে প্রখর বাস্তবতা। সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সমান্তরালে একটি আচ্ছন্নতার জগৎ। উপন্যাসে তমিজের বাপের কাছে রেখে যাওয়া চেরাগ আলি ফকিরের ওই খোয়াবনামা বইয়ের অবস্থাটির ভেতরেও ইঙ্গিত রয়ে গেছে। বইটি ছোঁড়াখোঁড়া। এই বইটাও বার বার ফিরে ফিরে এসেছে *খোয়াবনামার* আখ্যানে —

> খোয়াবের মানে খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে কিংবা খোঁজার জন্যই ফকির একটার পর একটা শোলোক গাইতো। আবার গোলাবাড়ি হাটে দোতরা বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে সে মানুষ জমাতো, মানুষজন জমা হলে শুরু হয়েছে তার স্বপ্নের বয়ান। তার রঙবেরঙের কাপড়ের তালি দেওয়া ঝোলা থেকে বার হতো ছেঁড়াখোঁড়া বই। সেই বইয়ের লেখা কি ফকির পড়তো, না-কি তার পাতায় পাতায় আঁকা চৌকো চৌকো সব রেখাগুলি গুনতো, তা অবশ্য তমিজের বাপ জানে না। তবে ঐ দাগগুলো সে আঁকতো ঘরের জমিনে। দাগ কেটে কেটে সে মানুষের স্বপ্ন বুঝে ফেলতো। কত মানুষের কত কিসিমের খোয়াব! (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ৬০)

লক্ষণীয় বইটি ছোঁড়াখোঁড়া এবং স্বপ্নের মানে বের করা হতো মাটিতে দাগ কেটে। — এই দুটো ব্যাপার কি ইঙ্গিতবহ নয়? এখানেও 'মাটি'-র কথা আছে। স্বপ্নপূরণ হাওয়া থেকে হয় না। মাটিতে তার একটা ভিত্তি চাই। উপন্যাসের পরিণতিতে খোয়াবনামা বইটি হারিয়েও যায়। কুলসুমের অনুযোগ, কেরামত আলি সেই বই বিক্রি করে দিয়েছে। তাহলে তো স্বপ্ন বিক্রির বিষয়টি ইঙ্গিত পেয়ে যায়। এমন অনেক ইঙ্গিতে *খোয়াবনামার* আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে, এর লক্ষ্য বাঙালি মুসলমানের শ্রেণি বাস্তবতাকে দেখিয়ে দেওয়া যে, কত রকমের সংস্কার-কুসংস্কার, আচার-বিচার, লড়াই-আপসের নমুনা সেখানে বিদ্যমান। সেই সঙ্গে হিন্দু জমিদারি এবং সামন্তবাদের ক্ষয়িত দশার পাশাপাশি হিন্দু নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত নিম্নশ্রেণির মানুষের সংঘাত, সহযোগিতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস একের পর এক ঘটনার চক্রে গড়ে ওঠে ভেঙে গেছে, আবার গড়ে উঠেছে। এবং সেই সঙ্গে দেখা গেছে — হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে মুসলিম মধ্যবিত্তের তুলনামূলক বিকাশের রূপরেখার নানান প্রসঙ্গ, দুটো উদ্ধৃতি থেকে এর একটু নমুনা দেখে নেওয়া যাক —

> ক. কয়েক বছর আগে বিলের উত্তরে কাশবন কেটে চাষবাস করার উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হলে টাউনের উকিল রমেশ বাগচি ওখানে ইটের ভাঁটা করার কথা ভাবছিলো। উকিলের ভাগ্নে টুনুবাবু। পয়সাকড়ি নিয়ে বোম্বাই না মাদ্রাজ ভাগলে এসব ভাবনা তারা ঝেড়ে ফেললো। তারপর কাদের একবার বাই তুললো ইটের ভাঁটা করবে। ওদিকে তো জঙ্গুলে জায়গা, কাঠের খরচ নাই। সস্তায় ইট করে প্রথমে না হয় নিজেদের বাড়িটাই পাকা করে ফেলবে। তা কাদেরের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা কী করে লাঠিডাঙা কাছারিতে পৌঁছুলে নায়েববাবুই একদিন মণ্ডলকে ডেকে পাঠিয়ে বলে, 'মণ্ডল, কর্তা আমাদের মাটির মানুষ। তার সহ্যশক্তিও অনেক। ভগবান একেকজন মানুষকে সৃষ্টি করেন ওইভাবে। কিন্তু চাষাভুষা প্রজাপাট সবাই যদি দরদালানে থাকতে শুরু করে তখন তাঁর সম্মানটা থাকে কোথায় বলো তো। ইঙ্গিত ধরতে পেরে শরাফত বলে, 'সেগলি দালানেত থাকলে দালানের ইজ্জত থাকে ক্যাংকা কর্যা? কথা ঠিকই কছেন বাবু। ধরেন, হামার কথাই ধরেন। বাপের ছনের ঘর আছিলো, হামি করলাম টিনের ঘর। আশীবাদ করেন বাবু'। নায়েবের আশীবাদ নিতে শরাফত অন্তত পাঁচ হাত দূরে মাটি ছুঁয়ে ফের উঠে দাঁড়ায়, 'আর্শীবাদ করেন, ওই টিনের ঘরত যেন মরবার পারি। ঘরত যানি হামার মরণ হয়'। তখন কাছারিতে সে নিয়মিত ভেট দিয়ে যাচ্ছিলো, শরাফতের এক কথাতেই নায়েবের গুজবটা সে বাতিল করে দেয়। (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ১১২-১৩)

> খ. শরাফত মণ্ডলের সঙ্গে বাপের বিবাদ করাটা তহসেন সায় দিতে পারেনি কখনোই। কাদেরের ক্ষমতা এখন মেলা। তার বড়ো ভায়ের ছেলেটা এবার ম্যাট্রিক দেবে, ছাত্র নাকি ভালো। তার ছোট বোন ভি এম গার্লস স্কুলে তহসেনের মেয়ের সঙ্গে পড়ে, সেটাও পরীক্ষায় ওপরদিকেই থাকে। আজিজ টাউনে বাড়ি কিনেছে হিন্দু পাড়ায়, কী সুন্দর বাড়ি। এইসব লোকের সঙ্গে তার বাপের গোলমাল। আর খাতির যত সব ছোটলোকের সঙ্গে। (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ২৮৯)

দেখা যাচ্ছে, ওপরের এই পর পর দুটো উদ্ধৃতির ভেতরে দুটো অবস্থার ক্রম পরিণতি ঘটেছে। পাকিস্তান তৈরি হলে কাদেরের অবস্থার আরো পরিবর্তন ঘটে। রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা তাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। কালাম মাঝির কনস্টাবল ছেলে পাকিস্তান আমলে দারোগা হয়ে ওঠে। তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে শহুরে ও আধুনিক হয়ে উঠতে থাকে। এসবই দেশভাগের একটি ফল, কিন্তু তমিজদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। এভাবে বাঙালি মুসলমানের একটি অংশের ধীরে ধীরে ক্ষমতা অর্জনের দিকটি ইলিয়াস হাজির করেন, অন্যদিকে দেখান যে, এই জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ থেকে যায় সমস্তরকমের সুবিধার বাইরে। এসব তার এই উপন্যাসের বহুস্বর সঙ্গতির বিষয়টি তৈরি করেছে। আড়ালে থেকে গেছে কৌতুকময় একটি বাস্তবতা, যেখানে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণির উচ্চশ্রেণির মতো পাকা দালান করলে তাতে উচ্চশ্রেণির সম্মান চলে যেত — কালের বিবর্তনে আর রাজনীতির পাঁকচক্রে পড়ে একসময়ের ক্ষমতাবান সে ক্ষমতাহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে, যেমনটা হয়েছে এই উপন্যাসের নায়েব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে; অন্যদিকে আবদুল আজিজ, আবদুল কাদের, কালাম মাঝির ছেলে তহসেন একটু একটু করে ঢুকেছে ক্ষমতা ও সুবিধার চত্বরে। — এক নির্মম, অমোঘ ঠাট্টার হাসি তখন পরিব্যাপ্ত হয় আখ্যান পাঠকের সামনে। এভাবে এই উপন্যাসের কার্নিভালীকরণ ঘটে।

ইলিয়াস এই উপন্যাসে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার পূর্ব অংশের মানুষ, পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের জীবনাচারের সমগ্রে পৌঁছে গেছেন। এই অংশের মুসলমান বাঙালি বা বাঙালি মুসলমানের এমন কোনো দিক নেই যা *খোয়বনামায়* একবারের জন্য হলেও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি পরীক্ষার সময় ডিম খেয়ে শূন্য পেতে হয় এই সংস্কারটিও এখানে আছে —

> শূন্যের সঙ্গে ডিমের সাদৃশ্য থাকায় হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় কয়েকটা দিন ছেলেকে স্কুলে যাবার সময় ভাতের সঙ্গে ডিম দেয়নি বলে আফসোসে হামিদা হাপুস নয়নে কাঁদে এবং রোগ সেরে গেলে তাকে রোজ, এমন-কি অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময়েও দুটো করে ডিম দেওয়ার মনস্থ করে। মায়ের কান্না এবং সংকল্পকে অগ্রাহ্য করে জ্বরের ঘোরে হুমায়ুন বিড়বিড় করে, 'আজ ডিম খায়া যাই মা। ভাত খাবো না। আজ তো হাফ ইস্কুল'। (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ৭৭)।

— এমন করুণ ঘটনার নির্মোহ কিন্তু করুণ হয়েও কৌতুককর বর্ণনার ভেতরে দিয়ে ইলিয়াস সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়কে বিস্তার দেন। অর্থের প্রসার ঘটানো, এবং এমন প্রত্যেকটি বিষয় তিনি হাজির করেন কার্যকারণ মেনে এবং পরিপ্রেক্ষিতসহ, অর্থাৎ সামাজিক বাস্তবতাসহ আর এর ভেতর দিয়ে তৈরি হয়েছে ভাষার সেই দ্বিবাচনিকতা এবং আখ্যানে

দেখা দিয়েছে বহুস্বর সঙ্গতি। এবং সবই গড়ে তোলে ঘটনার বর্ণনার দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বিবাচনিকতা ও বহুস্বর সঙ্গতির একটি দৃষ্টান্ত —

> গ্রামবাসীর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নায়েববাবু দুঃখিত হয়। নায়েববাবু বলে, 'আরে, মহাদেবের দিঘিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নমশূদ্ররা চালিয়ে দেয় সন্ন্যাসীর নামে। তাঁর দুর্গার সখের দিঘিতে বেজাতের মানুষের হাত পড়া কি দেবতা সহ্য করবেন? এই পাপ কি গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙার প্রজাদের, এমনকি এদের কলকাতাবাসী জমিদারবাবুকেও স্পর্শ করবে না'?
> কিন্তু কাদেরকে তো শরাফত মণ্ডল সব খুলে বলতে পারে না। মাথাগরম ছেলে তার, এসব শুনে আবার কী করতে কী করে ফেলে! না বাবা, জমিদারের কোপে পড়লে কাৎলাহার এপার-ওপার জুড়ে বিস্তীর্ণ জোত করার সাধ তার কখনো মিটবে না। নায়েববাবুকে সে চটায় কী করে। নায়েব এখন কত নরম মানুষ হয়েছে এই মানুষের রাগ কাদের কি কিছু দেখেছে? শরাফতের বাপচাচাকে কাছারির কোনো নায়েব তুইতোকারি ছাড়া ডাকেনি। অনেক আগে শরাফতের জ্যাঠা পিয়ারুল্লা মণ্ডলকে আগের নায়েব ডাকতো শিয়ারুল্লা বলে, এই নায়েবের আমলে সে পরিচিত হলো শিয়ালু বলে এবং মরার পরও ওই নাম থেকে জ্যাঠা তার রেহাই পায়নি, তার ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি সবার বাপদাদার নাম এখনো লেখা হয় শিয়ালু মণ্ডল। সেই লোকের ভাইপো হয়েও শরাফত নায়েববাবুর কাছে আসল নামে স্বীকৃত এবং তুমি বলে সম্বোধিত হয়। হবে না কেন? আল্লায় দিলে শরাফত কিছু জোতজমি করেছে, গিরিরডাঙায় বাপের ছনের ঘর ভেঙে টিন দিয়ে সব ঘর তুলেছে বড়ো বড়ো। তার দুই ছেলের একজন ম্যাট্রিক পাস করে সরকারি চাকরি করে, আরেকজন বছর তিনেক কলেজে পড়েছে। এ সবই তো জমির কল্যাণেই। আর নায়েব বাবুর নেকনজরটা না থাকলে জোতজমি কি আর হেঁটে হেঁটে তার হাতে আসে?
> কাৎলাহার বিলের কাছাকাছি এসে শরাফতের হাঁটার গতি হঠাৎ বাড়ে এবং রাস্তা থেকে সে নেমে পড়ে ডানদিকের জমির আলে। পাকুড়তলার দিকে হাঁটা দিলে তার গতি আরো বাড়ে এবং এতে কাদেরের অস্বস্তি টের পেয়ে সে বলে, 'হুরমতের জমিটা দেখ্যাই যাই। বুড়ো মরিচের কী করিচ্ছে বোঝা দরকার। মুকুন্দ তো দর এবার ভালোই দিবি কলো'। (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ৭৩)

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের দ্বিতীয়টি শরাফত মণ্ডলের নিজের কথা ডায়ালজিক ধরন পেয়ে বহুস্বর সঙ্গতি তৈরি করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, পুরাণ ও ধর্মীয় কুসংস্কারও যে শোষণের আরেকটি উপায় সেটি এখানে দেখা যাচ্ছে। নায়েব বলছেন মহাদেবের দিঘিকে নমশূদ্ররা চালিয়ে দিচ্ছে সন্ন্যাসীর নামে — এতে যে পাপ হচ্ছে, তা কলকাতায় থাকা জমিদারবাবুকে স্পর্শ করবে এবং সর্বনাশ হবে। — এই যে শ্রেণিবাস্তবতা আর মানুষকে ধোঁকা দেওয়া — সেটি তো নায়েব নিজেও জানেন না, কিন্তু এভাবে চলে আসছে শোষণের ধারা। ধর্মের নামে কুসংস্কারের নামে নিম্নবর্গের মানুষকে, প্রান্তিক মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে ক্ষমতার কাঠামো ভেঙে তৈরি হচ্ছে নতুন কাঠামো। জমিদারদের কর্তৃত্ব খর্ব হচ্ছে। আগে যাদের হেয় করা হতো তাদের এখন আর হেয় করা হচ্ছে না। কারণ তারাও একটু একটু করে অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছে। তুই তুকারি যাদের করা হতো, নাম নিয়ে ঠাট্টা করা হতো, যেমন শিয়ারুল্লা, শিয়ালু হয়ে গিয়েছে — এখন আর সেটি করা সম্ভব হচ্ছে না।

*খোয়াবনামা*তে সমান্তবাদী দশার একটি পরিণতি দেখি। কিন্তু জমিনির্ভর অর্থনীতি যে ক্রমে ব্যবসানির্ভর বা অর্থ নির্ভরতার দিকে যাচ্ছে সেই ইঙ্গিতও পাই। যেভাবে পুঁজিবাদী সভ্যতা স্থাবর সম্পত্তির জায়গায় অস্থাবর সম্পত্তি দিয়ে মানে যার যত জমি আছে তা দিয়ে নয়, কার কত অর্থ আছে তা দিয়ে ক্ষমতার নতুন বিন্যাস তৈরি করে সেটির আভাস এ উপন্যাসে দেখা দিতে শুরু করেছে। জমিনির্ভরতা ভেঙে ব্যবসানির্ভরতা তৈরি হচ্ছে। ফলে শরাফত মণ্ডল মুকুন্দের সঙ্গে মরিচের ব্যবসা করে।

মাত্র তিনটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কত কীই না উচ্চারিত হয়েছে। ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে উল্লিখিত কথার তলে কাজ করা অনুল্লেখিত কথাগুলি। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কার-কুসংস্কার, জাতের ওঠার লক্ষণগুলি ধরা পড়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে উৎপাদন, তদারকি ও হিন্দু-মুসলমানের কৃষিজ ও ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের দিকগুলি। অনেক শব্দই তার প্রচলিত অর্থ পেরিয়ে বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। 'তুই' থেকে 'তুমি'-র স্তরের দূরত্ব যে অনেক সেটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে শ্রেণিগত ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। এভাবে শব্দকে, ভাষার ব্যবহারকে তার সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখার বিষয়টিকেই বাখতিন গুরুত্ব দিয়েছেন।

শরাফত মণ্ডলের বড় ছেলে আবদুল আজিজের পুত্র হুমায়ুনের চল্লিশার সময়ের বর্ণনা থেকে দ্বিবাচনিকতা ও বহুস্বর সঙ্গতির আরো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক —

> আবদুর কাদেরের মেহমানরা টাউনের যত দাপটের বান্দা হোক না কেন শরাফত মণ্ডলকে তারা ওঠাবে কতটা? তারা দল বেঁধে এসেছে, জমিয়ে গপ্পোগুজব করছে। তারা পাকিস্তান, মুসলিম লীগ, কংগ্রেস গান্ধিজি, জিন্না সাহেব, ইলেকশান, জহরলাল, কৃষক প্রজা পার্টি, হক সাহেব, সোরোয়ার্দি, আবুল হাশেম, নাজিমুদ্দিন, আলিগড়, ইসলামিয়া কলেজ নিয়ে মেলা বাক্য ছাড়বে। মানুষ হাঁ করে ওইসব শোনে এবং বেশিরভাগ কথা না বুঝে কিংবা বোঝে না বলেই অভিভূত হয়। লোকগুলি তারপর 'স্লামালেকুম' বলে টমটমে চেপে টাউনের দিকে রওয়ানা হলে লোকজন অনেকক্ষণ বিলীয়মান টমটমের দিকে তাকিয়ে থাকে। টমটম চোখের আড়াল হতেই তাদের কথা লোকে ভুলে যাবে, তাদের কথাবার্তার যেটুকু বুঝেছে তাও ভুলে যাবে। কিন্তু শিমুলতলীর মিয়াদের সঙ্গে এক কাতারে না হলেও একই দিনে, একই জেয়াফতে, একইবাড়িতে ভাত খাবার কথা তারা জীবনে ভুলবে না। (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ৯৭)

এখানে যে সব ব্যক্তি, ঘটনা, দল, স্থান প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তাতে বহুস্বর সঙ্গতি বা পলিফনি তৈরি হয়েছে। কারণ এক এক শব্দের সঙ্গে ইতিহাসই কেবল জড়িত নয়, এক একটি শব্দকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক একটি আখ্যান। পাকিস্তান শব্দটি স্বয়ং *খোয়াবনামার*ই আখ্যান তৈরি করেছে। তেমনি মুসলিম লীগ, কংগ্রেস গান্ধীজি কি কৃষক প্রজা পার্টি — প্রত্যেকটি নিয়ে আলাদা আখ্যান আছে। এ নিয়ে অন্যান্য উপন্যাসও লেখা হয়েছে। ফলে *খোয়াবনামা*তে একটি শব্দ 'পাকিস্তান' যে আখ্যান তৈরি করেছে বা 'মুসলিম লীগ'-এর সঙ্গে 'তেভাগা আন্দোলনে'র রেশ এসে লেগেছে এই উপন্যাসে তাতে, এর কাহিনি আরো বাকি রয়ে গেছে। সেটা এ উপন্যাসের জন্য নয়, অন্য উপন্যাসের আখ্যান তৈরি করে দিতে পারে। আবার অন্য উপন্যাসে যেখানে একইভাবে এই শব্দগুলি প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে যেমন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*, সেখানে গ্রামীণ জীবনের আরেকটি দিক পাওয়া যায়, সেখানেও এসেচে পাকিস্তান আন্দোলন,

মুসলিম লীগের কথা এবং সেখানেও দেখা যায় সামন্তবাদের ক্ষয়িষ্ণু দশা — ফলে মনে হয়, *খোয়াবনামা* ও *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* — এই দুটো উপন্যাস একটির সঙ্গে আরেকটি কথা বলে। উমাবর্তো ইকোর দ্য নেইম অব দ্য রোজ-এ পাওয়া যাচ্ছে এমন কথা :

> অনেক সময়ই একটি বই আরেকটি বইয়ের সঙ্গে কথা বলে। অনেক সময় একটি নিরীহ বইয়ের মধ্যে থেকে যায় এমন এক বীজ যা পরবর্তী সময়ে পল্লবিত হতে পারে কোনো বিপজ্জনক গ্রন্থে। (রণবীর, ২০১১ : ১১০)

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে-র ভেতরে *খোয়াবনামার* মতো আরো আরো উপন্যাসের বীজ লুকিয়ে আছে, সেটি ওই শব্দগুলির পটভূমিকে খুঁজতে গেলেই পাওয়া যাবে। বলাবাহুল্য, *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে এবং *খোয়াবনামা* ১৯৯৬ সালে। দুটোরই অন্যতম বিবেচনা দেশভাগ-পূর্ববর্তী সমাজ ও রাজনীতি। ফলে এই দুটো উপন্যাসের মধ্যে যে সংলাপ তৈরি হতে পারে — সেটিই স্বাভাবিক। ফলে *খোয়াবনামা* পূর্ববর্তী উপন্যাসের কথাও মনে করায় যার উপজীব্য প্রায় একই বিষয়।

এভাবে *খোয়াবনামার* প্রতিটি অনুচ্ছেদ, যেগুলিতে কেবল ঘটনা সংঘটন বা অ্যাকশানের বর্ণনা তৈরি হয়েছে — তার সঙ্গে জুড়ে থাকা অনুচ্ছেদে, বাখতিনের তত্ত্বানুযায়ী আমরা দ্বিবাচনিকতা ও বহুস্বর সঙ্গতির দৃষ্টান্ত পাই।

তবে *খোয়াবনামাকে* সামগ্রিকভাবে বাখতিনের যে তত্ত্বে বিশেষভাবে দেখা যেতে পারে তা হলো তার কার্নিভাল তত্ত্ব, আদতে সেটিই দ্বিবাচনিকতা এবং বহুস্বর সঙ্গতির উৎস। কিন্তু এ উপন্যাসের মূল চেতনার সঙ্গে, এর সত্তার দিকটি কার্নিভাল তত্ত্বের ছকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ এর আখ্যানগুলির বড় অংশ জুড়ে আছে প্রান্তিক মানুষের কথ্য ভাষা ব্যবহারের ভেতর দিয়ে তাদের আশা-স্বপ্ন-আচ্ছন্নতা- রাগ-ক্ষোভ-কৌতুকবোধ-ঠাট্টা এবং স্ল্যাং তথা অশ্লীল গালিগালাজ। লোকবিশ্বাস ও এর সাংস্কৃতিক পটভূমির সঙ্গে সৃষ্টি হয় প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্ব ও সংগ্রাম। তাদের নিয়ে তৈরি হয় রাজনৈতিক চালচিত্র। তমিজ, তমিজের বাপ থেকে শুরু করে *খোয়াবনামার* চাষী-চামার-কামার-মাঝির প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেকটি মানুষ সেই রাজনীতির অংশ, কিন্তু রাজনীতিতে তাদের সরাসরি নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু প্রতিবাদ থেকেও তারা সরে আসে না। তাদের তেমনই একজন প্রতিনিধি তমিজ। কেরামত আলি ও বৈকুণ্ঠ গিরিকেও আমরা পাই তেমনি পরিপ্রেক্ষিতে। তাদের বিশ্বাসের জায়গাটিতে ক্রিয়া করে গণমানুষের প্রকৃত আশা আকাঙ্ক্ষা। যেমন —

> যমুনার পেটে যাওয়ায় মাদারিপাড়ার মানুষজনের ভাবসাব দেখে মনে হতো, ওরা সবাই মজনু শাহের একেকটা পালোয়ান। শালারা খেতে পায় না, পাছায় কাপড় নাই, এক ছটাক জমি নাই, এদিকে গলার তেজ ষোলো আনা। লাঠি হাতে করে ভিক্ষা করে ভিক্ষা না দিলে শাপমাণ্যি করে, ভয় দেখায়। চেরাগ আলি তো ওই পালোয়ানদের গুষ্টির মানুষ। কেরামত তো তার মুখেই শুনেছে, করতোয়ার পুবে পশ্চিমে 'সবই ছিলো মজনুর দাপটে, গোরারা জরব দখল করিছে'।
> 'কথা ঠিক'। বৈকুণ্ঠ খানিকটা মেনে নেয়, 'মুনসি আছিলো ভবাণী পাঠকের সেনাপতি। গান শোনো নাই, 'ভবানী নামিল রণে, পাঠান সেনাপতি সনে', এই সেনাপতিটা কও তো কেটা'?
> কেরামতের নীরবতায় তার অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়েছে ভেবে বৈকুণ্ঠের আত্মবিশ্বাস বাড়ে,

> 'পাকুড়গাছের মুনসি হলো ওই সেনাপতি। মজনু শাহের নিজের মানুষ আছিলো তাঁই। এখনো কালীপূজার আত্রে ভবানী পাঠকের আদেশে মুনসি কাৎরা ভাসায়া দেয় বিলের মধ্যে, ওই কাৎরার মধ্যে কালা পাঠা বলি দিবার পারে তো তোমার সর্ব পাপ মোচন হবি। আরে এই খপর তো এটিকার ক্যাচলা ছোলও জানে'।
> কিন্তু কেরামত তো জানে, 'কিন্তু ফকির কতবার কছে, গানের মধ্যেও কছে, মুনসি আছিলো মজনু শাহের খাস মানুষ'।
> এতেও বৈকুণ্ঠের আপত্তি নাই, 'কথা ঠিক। ভবানী পাঠকের কাছে মজনু বার্তা পাঠালো কী? না, তোমার আছে আলি, হামার আছে কালি। তোমার তাকত আলি হাতত আর হামার শক্তি আছে মা কালির কাছে। — ঠিক কি-না? হামরা একত্তর হই। আলি ও কালি একত্তর হলে কোম্পানি এক ঘড়ি খাড়া থাকবার পারে? — তা হলে বোঝ। তখন দুইজনের মানুষ আর আলাদা থাকলো না। মুনসি তখন ভবানী সন্ন্যাসীর হুকুম শুনবি না কিসক'? দৃষ্টান্ত পর্যন্ত দেয় বৈকুণ্ঠ, 'না হলে এখনো মুনসি বিলের মধ্যে কাৎরা ভাসায় কিসক'? (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ১৫৩-৫৪)

তাহলে প্রতিপক্ষ দুজনের একই — ইংরেজ শাসক। বৈকুণ্ঠ আর কেরামত দুজনে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু তারা মিলতে চায়। একটি প্ল্যাটফরম খুঁজে পেতে চায় দাঁড়াবার এবং লড়াই করবার। একজনের 'আলি' অন্যজনের 'কালি' — দুয়ের সম্মিলিত শক্তি তাদের কোথায় নিয়ে দাঁড়া করায় সেটি তারা চিন্তা করতে পারে। আগে দেখানো হয়েছে ধর্ম ও কুসংস্কার শোষণের অন্যতম হাতিয়ার, উল্টোদিকে দেখা যাচ্ছে ধর্মই হয়ে উঠতে পারে প্রতিরোধের আরেক মাত্রা। যেমনটা লাতিন আমেরিকায় লিবারেশন থিওলজির ক্ষেত্রে দেখা গেছে। সেভাবে নিম্নবর্গের মানুষ তাদের দিক থেকে ধর্মকে সম্বল করে একত্র হতে পারে। ধর্মও হতে পারে শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার। বিবেকানন্দের তত্ত্বের সঙ্গে লিবারেশন থিওলজির মিল দেখাতে গিয়ে যতীন সরকার এই নিয়ে নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করেছেন,

> মার্কস যাকে বলছেন 'শ্রেণী', বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তা-ই হয়েছে 'বর্ণ'। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র — এই চারটি শ্রেণী পর পর পৃথিবী শাসন করে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজত্বের অবসান আগেই হয়ে গেছে। এখন, অর্থাৎ বিবেকানন্দের সমসময়ে, চলছে বৈশ্যশাসন। ধনতন্ত্রী ব্যবস্থাকেই বিবেকানন্দ বলেছেন বৈশ্যশাসন। এরপর আসবে শূদ্রশাসন বা প্রলেতারীয় শাসনের যুগ। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র। (যতীন, ২০০০ : ২৮)

খোয়াবনামার ভেতরেও সেই সম্ভাবনা তৈরি হওয়া ও না-হওয়ার দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। একদিকে সামন্তবাদ, নব্য পুঁজির ক্রম-উত্থান এবং অন্যদিকে নিম্নবর্গের মানুষের লড়াই। এবং দুপক্ষেরই অবলম্বন ধর্মীয় সংস্কার-কুসংস্কার। ফলে সংস্কার-কুসংস্কার মিলে একটি সম্মিলিত শক্তির উদ্বোধনে লোকজ বিশ্বাস, *খোয়াবনামা* উপন্যাসে যে ভূগোলে তৈরি, সেখানে ক্রিয়া করেছে, বৈকুণ্ঠের কথা অনুযায়ী 'এটিকার ক্যাচলা ছোলও জানে।' ফলে প্রতিবাদের একটি মানসকাঠামো কাজ করে চলেই। আর সুযোগ পেলে সেটি প্রকাশিতও হয়। তখন মানুষ কোনো বাধার বা তাদের কাজের পরিণতির কথা মনে রাখে না। মাঝিরা তাদের নিজেদের অধিকারে সোচ্চার হয়ে যে ঘটনা ঘটিয়েছিল কাৎলাহার বিলে, তার আগে তাদের উত্তেজনা ও ক্ষোভের ছবিটা দেখে নেওয়া গেলে সেটি বোঝা যায় —

> কালাম মাঝির পৃষ্ঠপোষকতায় কেরামত আলি পিঠে তো বটেই বুকেও বেশ বল পায়। তার এলোমেলো মাথায় মাঝিদের নিয়ে লেখা পদ্যটা দানা বাঁধে। কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাসগুলো মনে না

> পড়ায়, কিংবা বিনয়ে বা দ্বিধাতেও হতে পারে, তাকে সেঁটে থাকতে হয় সাদামাটা গদ্যের সঙ্গেই,'আপনারা জনেন তো সবই। কিন্তু শেখেন না কিছুই। না শিখলে জানার ফল কী? সেই জানায় ফায়দা কী? জয়পুরে দেখিছি, বর্মণী মা পুলিশের গুলি খায়াও হিরদয়ে বল রাখে। তার হুকুমে চাষারা তীর চালায়। আর এটি, এই গিরিরডাঙা গাঁয়ে দেখি মাঝিদের চৌদ্দপুরুষের বিল দখল করে ভিন্ন জাতের মানুষ আর মাঝিরা বস্যা বস্যা খালি বাল ছেঁড়ে'।
>
> কেরামত আলি কথা বলেই চলে, আর জুম্মাঘরের মাঝিরা সব দাঁড়ায় সোজা হয়ে। তমিজের বাপ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে চোখ রেখে খুঁজতে থাকে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথান। জুম্মাঘরের জংধরা টিনের চাল হাত খানেক ওপরে ওঠে, সেখানে ঢংঢং ঘণ্টা বাজে। কিন্তু এই বিকট ঘণ্টাধ্বনি চাপা পড়ে তমিজের চিৎকারের নিচে,'কিসক? হামরা বাল ছিঁড়মু কিসক? চলো! সোগলি চলো গো! সোগলি বাড়িত যায়া জাল পলো যা আছে লিয়া আসো। আজ কাৎলাহার মুখে চলো'। (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ১৯১)

এখানেও ফের সম্মিলিত শক্তির উদ্ভাস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এর জন্য পৃষ্ঠপোষকতা চাই। কিন্তু *খোয়াবনামার* পাঠক মাত্রই জানেন, সেই পৃষ্ঠপোষকতা ততটা শক্তিশালী নয়। ফলে এই প্রতিরোধ, প্রতিবাদ যে দ্রুতই ভেঙে যাবে, সেটিও আগাম বুঝতে পারা যায়। ফলে এরকম একটি পরিস্থিতি তৈরি করে আরেক নির্মম কৌতুক। কারণ তাদের নিজেদের আসলে যে পুঁজি যে রাজনৈতিক সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি এবং শক্তিশালী নেতৃত্ব — এর কোনোটাই নেই। ফলে সেটি যে ব্যর্থ হয়ে যাবে — সেটি ইলিয়াস না বলেই বুঝিয়ে দেন। আদতে *খোয়াবনামায়* ওপরের বাস্তবতায় এই অসংগতির দিকগুলি উঠে এলেও এর তলের উদ্দেশ্য বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্য মানুষের খামতি-ঘাটতির জায়গাগুলি দেখিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেটি তো তলে কাজ করে। ওপরে কাজ করে বাস্তবতা। যে বাস্তবতায় যারা লড়াই করতে চায় তাদের আরেক চেহারা আছে। দেখানো হয়েছে যে, ওই মানুষগুলিই যখন জেয়াফতে বসে খাচ্ছিল সেখানে তৈরি হয়েছিল কৌতুকময় পরিস্থিতি। —

> সারি সারি মানুষ অপেক্ষা করছে গোশতের জন্য। গোশতের বালতি নিয়ে ছুটছে হুরমতুল্লা, কালুর বাপ, হামিদ সাকিদার, গফুর কালু, তমিজ — মোনাজাতের দিকে এদের খেয়াল নাই। খানকা ঘরের বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে আবদুল আজিজ হঠাৎ জোরে নির্দেশ দেয়, 'মোনাজাত হচ্ছে, মোনাজাত — সবাই হাত তোলেন'। পরপরই মওলানার স্বর হঠাৎ চড়ে গেলো।
>
> মওলানার মোনাজত হচ্ছিলো উর্দুতে, উর্দুতে সমবেত জনতার অজ্ঞতা এই ভাষার প্রতি তাদের ভক্তি উস্কে দেয় এবং এর রহস্যময়তা আরবি আয়াতের সঙ্গে সবরকম ফারাক মোচন করে। ওদিকে পঙক্তিতে বসা লোকজনের অনেকেই অধৈর্য হয়ে নুন দিয়েই ভাত মেখে খেতে শুরু করেছে। এমন-কি, কারো কারো 'ক্যা গো তরকারি দিবা না'?'ভাত কি শুধাই খাওয়া লাগবি'? 'তোমরা কিসের সাকিদারি করো? পাতেত গোশতো কুটি' প্রভৃতি অভিযোগ ঠোকঠুকি লাগে মোনাজতের সঙ্গে। এতে বিরক্ত হয়ে কাদের আজিজের পাশে দাঁড়িয়ে হুকুম ছাড়ে,'খামোশ'! এই শব্দটির অর্থ পরিবেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকেদেরও জানা না থাকায় ঘাবড়ে গিয়ে গোশতের বালতি মাটিতে রেখে তারা মোনাজাতের জন্য হাত তোলে এবং তাদের দেখাদেখি হাত তোলে খেতে বসা মানুষের অনেকে। নুন দিয়ে ভাত যারা মেখে ফেলেছিলো তাদের লাগে ভাতে গন্ধ এবং ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনং-এর তৃপ্তির বদলে তাদের পেটে তারা পায় খিদের নতুন মোচড়। (ইলিয়াস, ১৯৯৬ : ৯৬)

এইভাবে গণমানুষের ক্রোধ ও কৌতুক ছড়িয়ে আছে এ উপন্যাসের প্রায় সবখানে, সঙ্গে আছে হিংসা ও দখলের মানসিকতা।

জমি নিয়ে হুরমত আর তমিজের প্রতিযোগিতা, বিল নিয়ে শরাফত ও কালাম মাঝির দখলের খেলার পাশাপাশিই চলে কুলসুমের কাছ থেকে খোয়াবনামা বইটি নিজের আয়ত্তে আনার জন্য কেরামত আলির চেষ্টা। কেরামত আলির থেকে সেই বই নিয়ে নেয় আলিম মাস্টার। এই সব ছোট ছোট দখলদারীর সঙ্গে চলে রাজনীতির ক্ষমতা দখলের পালাবদল। ইসমাইল হোসেনরা কী করে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে চলে আসতে চায়, তার বৃত্তান্তও *খোয়াবনামার* অনেকটা জায়গা জুড়ে বর্ণিত। উঠতি মধ্যবিত্তের শহরের দিকে যাত্রাটিও উচ্চারিত হতে বাকি থাকে না। ঠিক তখন আত্মগোপনে থাকা তমিজ কেন্দ্রের দিকে যাওয়ার সময়ই প্রান্তের দিকে রওনা দেয়। তেভাগার স্বপ্ন সে ছাড়তে পারে না। আর উপন্যাসের একেবারে শেষে দেখা যায় — তমিজের মেয়ে সখিনা কাৎলাহার বিলে উত্তর সিথানে জখম চাঁদের নিচে জ্বলতে থাকা জোনাকির হেঁসেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক আচ্ছন্নতা দিয়ে যে আখ্যানে শুরু হয়েছিল, সেটির শেষও আগামী আচ্ছন্নতার দিকে তাকিয়ে। ফলে এই বোধ প্রখর হয় যে, ক্ষুধার মতো তীব্র বাস্তবতার চেয়েও মানুষের স্বপ্ন কোনো কোনো সময় বড় হয়ে যায়। — ইলিয়াস *খোয়াবনামার* ইতি টানেন প্রান্তিক মানুষের সেই গন্তব্যহীন স্বপ্নের দিকে চোখ রেখে। তাই উপন্যাসের আপাত সমাপ্তি ঘটে কিন্তু এর অভিমুখ তখন গণমানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রামের নিরন্তর বাস্তবতার দিকে।

খোয়াবনামায় বাখতিনের দ্বিবাচনিকতা ও বহুস্বর সঙ্গতির জায়গাগুলির কিছু দৃষ্টান্ত হাজির করার পরও একথা বলতে হয় যে বাখতিন যেমন কার্নিভাল সাহিত্যেই এর উৎসমুখ খুঁজে পেয়েছিলেন, *খোয়াবনামাও* উপন্যাসত্বের উৎসে পৌঁছায় এই বৈশিষ্ট্যেরই কারণে। কারণ *খোয়াবনামার* আখ্যানগুলির ভেতরে লোকায়ত সংস্কৃতির নানা দিকই প্রবলভাবে কাজ করেছে। ইলিয়াসও মনে করতেন, লোকজ সাংস্কৃতির ভেতরে থাকে আখ্যানের প্রকৃত শক্তি ও সম্ভাবনা। তাঁর একটি চিঠি থেকে সেই চিন্তাটি দেখে নেওয়া যেতে পারে —

> দেশবাসীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতিই হলো দেশের উন্নত সংস্কৃতির ভিত্তি। আমাদের মতো গরিব দেশে তো বটেই, উন্নত পশ্চিমেও সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় পেতে হলে অনুসন্ধান চালাতে হয় ওদের লোকজীবনের ভেতর। এখন যে তর্কটা সেদিন উঠেছিলো তা হলো এই যে, শিল্পসাহিত্য চর্চা যারা করে তারা মোটামুটি সবাই শহরের মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছে। তাদের পক্ষে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী সংস্কৃতি কতোটা জানা সম্ভব এবং এর আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা।
> আমার মতে এটা জানা খুবই দরকার। শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হলেও এই দুটি কিন্তু অবিচ্ছিন্ন নয়, সংস্কৃতি কোনো একজন মানুষের নির্মিত নয়, হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষের জীবনযাপন, অভ্যাস, প্রথা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আশা, বেদনা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে সংস্কৃতি বিকশিত হয়, বিবর্ধিত হয়, বিকৃতও হতে পারে। এর বিকাশ, বিবর্তন বা বিকৃতি বলা যায় মানুষে ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই ঘটে থাকে, তবে প্রকৃতির মতো ইতিহাস, রাজনীতি ও উঁচু মানের শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলে। আর সাহিত্যসৃষ্টি একজন মানুষের সৃজনশীল ও সচেতন প্রয়াসের ফল। এখন মানুষের গভীর ভেতরটার খানাতল্লাসি করেন বলে লেখককে জানতে হয় তার আগাপাশতলা। এখানে তার সংস্কৃতির যথাযথ পরিচয় সম্বন্ধে লেখক উদাসীন হলে মানুষকে তিনি চিনবেন কি করে? এই মানুষ মধ্যবিত্ত হোক আর উচ্চবিত্ত হোক তার সংস্কৃতির উৎস রয়ে গেছে দেশের বিপুল

> সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনযাপনের ভেতর। যে কোনো লেখকই নিজের মাতৃভাষার অমিত সম্ভাবনাকে দেখতে পান নতুন করে, তাই তাঁর চিন্তা ও প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসাবে এটিকেই বেছে নেন। ভাষার মতো সংস্কৃতিকেও তিনি ব্যবহার করেন, পূর্ববর্তী বড়ো লেখকের তৈরি ভাষার ওপর একশো ভাগ নির্ভর করলে নিজের কথা তিনি সারা জীবনেও বলতে পারবেন না, সমসাময়িক ভাষার ওপর ভিত্তি করেই তিনি নিজেকে প্রকাশের উপযোগী ভাষা নির্মাণ করে নেন। একই সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতিকেও গুরুত্ব দেন, কারণ এ ছাড়া মানুষকে লেখায় নিয়ে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এই সংস্কৃতির শেকড় লোক জীবনের ভেতর প্রোথিত বলে সেখানে তাঁকে আগ্রহী হতেই হয়। (ইলিয়াস, ২০০০ : ৩০১)

ফলে লেখক গণমুখী না হলে তিনি তার নিজস্ব ভাষার মুখটিও আবিষ্কার করতে পারেন না। কেননা তিনি আত্মকেন্দ্রিক হতে পারেন না, সৃষ্টির জন্য তাকে উৎস কেন্দ্রিক হতেই হয়। আর সেই উৎসে আছে তার দেশ ও মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি। তিনি সেখানেই তার রসদ পেয়ে যান। এভাবে একটি দেশের একই কালে অনেক লেখক যদি এইভাবে গণমুখী সংস্কৃতির সারবত্তাকে তাদের লেখায় আনতে পারেন তাহলে জাতীয় সংস্কৃতি একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে যেতে পারে। তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে,

> নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি গবেষণায় এখন প্রমাণিত যে বৃহৎ ঐতিহ্য সম্মিলিত ভাবে জাতীয় সংস্কৃতির জন্ম দেয়। কিন্তু উদ্ধত আধিপত্যবাদ এই সত্যকে অস্বীকার করতে চায় বলে সমস্ত অপর পরিসরের অস্তিত্ব মুছে ফেলে এবং কোথাও কোথাও কোনো বিকল্পের সম্ভাবনাও স্বীকার করে না। চূড়ান্ত এই এক বাচনিকতা ও রুদ্ধতাকে মোকাবিলা করতে দেখা দেয় কার্নিভালের বিপ্রতীপায়ন। দ্রোহাত্মক এই প্রবণতাকে কেউ কেউ বলেছেন সংযোগের নতুন আকল্প। (তপোধীর, ২০০৯ : ৯১)

সিরিল ইমারসনের মতে, যেটি আসলে 'কার্নিভাল ডাইন্যামিক্স' (Caryl Emerson, 1997 : 163)-এর মাধ্যমেই আবিষ্কৃত হয় ভূমিসংলগ্ন জীবনের দ্রোহ, ক্ষমতা-দম্ভ মোকাবিলার জন্য লোকচেতনার অন্তর্ঘাত। এর প্রকাশ কখনো চরায় আটকে পড়ে না। রুদ্ধ অচলায়তনে প্রতিস্পর্ধা জানাতে এর তুলনা নেই। একে বাখতিন বলেছেন কার্নিভালকৃত লিখন-প্রয়াস (তপোধীর, ২০০৯ : ৯১) —

> which has taken the carnival spirit into itself and thus reproduce within own structures and by its own practice, the characteristic inversions, parodies and discrowings of carnival proper. (Simon, 1995 : 65)

কার্নিভালের এই লিখন-প্রয়াসের প্রয়োগ ইলিয়াসের *খোয়াবনামায়* দেখা যায়। ইলিয়াস যে সংস্কৃতির উদ্বোধনের কথা বলেন তার মূলের সঙ্গে বাখতিনের এ তত্ত্বটি মিলে যায়। বাখতিনের কার্নিভাল ভাবনা তাই সাহিত্যের উজ্জীবনে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হতে সহায়তা করে। এর যথাযথ উপস্থাপনায় প্রচ্ছন্ন থাকে যে বহুরৈখিকতা ও অজস্র অন্তর্বয়ান তা আবিষ্কারের নতুন নতুন পথ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর এই ভাবনা আরোপিত আভিজাত্যের সম্পর্কেও প্রশ্ন করতে শেখায়, প্রতাপ-পীড়ন-কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে অনুভূত হয় লোকায়ত পৌরুষের উপস্থিতি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়বানামার* সত্তাকে বুঝে নিতে বাখতিনের কার্নিভাল তত্ত্বটি তাঁর দ্বিবাচনিকতা ও

বহুস্বরের সঙ্গতির চেয়ে বেশি কাজ করেছে — এমনটি না বলে বলতে হয় — বাখতিন যে এই তিনের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের কথা বলেছেন, সেটি এখানে ঘটেছে, তবে ইলিয়াসের বিশিষ্ট নির্মাণ একে আলাদামাত্রায় উন্নীত করেছে। কারণ একথা তো সত্য, তত্ত্ব মেনে সাহিত্যশিল্প সৃষ্টি হয় না, কিন্তু সাহিত্যশিল্প সৃষ্টি হওয়ার পরে তত্ত্ব দিয়ে তার নানান ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা যায়। বাখতিনের তত্ত্ব দিয়ে সেটুকু *খোয়াবনামার* ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা গেছে মাত্র, এর বেশি নয়।

গ্রন্থপঞ্জি

অমিতাভ দাস (২০১০)। *আখ্যানতত্ত্ব*, ইন্দাস, কলকাতা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯৬)। *খোয়াবনামা*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

(১৯৯৭)। *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০০৯)। *বাখতিন*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

দেবেশ রায় (১৯৯১)। *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(১৯৯৪)। *উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

(২০১০) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : নিরন্তর মানুষ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

বদিউর রহমান (২০০৫)। *উপন্যাস ও জনগণ* (মূল : র‍্যালফ ফক্স), প্যাপিরাস, ঢাকা।

রণবীর লাহিড়ী (২০১১)। *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান*, চর্চাপদ, কলকাতা।

Caryl Emerson (1997). *The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

David Macey (2001). *The Penguin Dictionary of Critical Theory*, Penguin Books, London.

Mikhail Bakhtin (1999). *Problems of Dostoevsky's Poetics* (Edited and Translated by Caryl Emerson, Introduction by Wayne C. Booth), University of Minnesota Press, Minneapolis, London.

(1981). *The Dialogic Imagination: Four Essays* (Trans. C. Emerson and M. Holquist), University of Texas Press. Texas.

Nadezhda Kashina (1987).*The Aesthetics of Dostoyevsky*, (Trans. Julius Katser), Raduga Publishers. Moscow.

Peter Barry (2011). *Beginning Theory*, Viva Books, New Delhi.

Simon Dentith (1995). *Bakhtin Thought*, Routledge, London

প্রবন্ধপুঞ্জি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (২০০০)। 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পত্রাবলি', *নিরন্তর* (নাঈম হাসান সম্পাদিত), ঢাকা।

বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, (১৩৯৭)। 'মিখাইল বাখতিনের উপন্যাস ভাবনা', *উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব* (অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ সম্পাদিত), *গাঙ্গেয়পত্র*, কলকাতা।

যতীন সরকার (২০০০)। 'স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী, লিবারেশন থিওলজি ও আজকের পৃথিবী', *নিরন্তর* (নাঈম হাসান সম্পাদিত), ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ (২০০০)। 'কাৎলাহার রহস্যকথা ও ভূগোল-পারম্পর্য', *নিরন্তর* (নাঈম হাসান সম্পাদিত), ঢাকা।

সহায়ক পত্রিকা

নাঈম হাসান [সম্পা.] (২০০০)। *নিরন্তর*, ঢাকা।

বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত [সম্পা.] (২০০৭)। *স্যামুয়েল বেকেট*। এবং মুশায়েরা, কলকাতা।